সত্য-ধর্ম্ম।

(প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, গুরুতত্ত্ব ও ধর্ম্মার্থীর কর্ত্তব্য সহিত)

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলুষানল দগ্ধানাং শান্তয়েঽমৃতবারিভিঃ।
প্রকাশ্যতে সত্যধর্ম্মো মুক্তয়ে মুক্তিকাঙ্ক্ষিণাম্॥

ঢাকা, বাঙ্গালাবাজার কাশী প্রিণ্টিং ওয়াকস্‌ হইতে,
শ্রীবরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯।

মূল্য ১।০ মাত্র।

সত্য-ধর্ম্ম।

(প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, গুরুতত্ত্ব ও ধর্ম্মার্থীর কর্ত্তব্য সহিত)

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলুষানল দগ্ধানাং শান্তয়েঽমৃতবারিভিঃ।
প্রকাশ্যতে সত্যধর্ম্মো মুক্তয়ে মুক্তিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥

ঢাকা, বাঙ্গালাবাজার কাশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে,
শ্রীবরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯।

মূল্য ১।০ মাত্র।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

"সত্যধর্ম্ম" প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। আর অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও নিবদ্ধ করা হয় নাই। ধর্ম্মার্থী পাঠকগণ সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের যথোচিত বৃত্তান্ত পশ্চাৎ-প্রকাশ্য গ্রন্থসমূহে অবগত হইবেন।

২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ প্রথমে ১২৯৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতৎ পাঠে বহুসংখ্যক লোকে অত্যাসক্ত এবং প্রথম বারের পুস্তক নিঃশেষিত হওয়াতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে ইহাতে কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রকাশক।

সত্য-ধর্ম্ম।

মুখবন্ধ।

আহা! জগতের আজ কি শুভদিন! কি আনন্দময় দিন!! কি অমৃতময় দিন!!! কোটি কোটি মানবের উদ্ধারের পথ আজ প্রকাশিত হইল। পাপপূর্ণ জগৎ আজ পরিত্রাণের পথ প্রাপ্ত হইতে চলিল!! ইহা অপেক্ষা সুখের—আনন্দের দিন আর কি হইতে পারে??? হে মানবগণ! তোমরা প্রস্তুত হও; তোমাদিগের পরিত্রাণ করিতে পরম পিতা আজ উদ্যত হইয়াছেন।

সত্যধর্ম্মের যথাযথ বিবরণ এই গ্রন্থের প্রকরণবিশেষে বিবৃত হইবে। মুখবন্ধে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, নিরাকার (১), অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি-অনন্ত, অসীম, অনন্ত-গুণ-নিধান পরম পিতার উপাসনা করিবে। মনুষ্য স্ব-কৃত কর্ম্মানুসারে আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি ভোগ করে, দেহ-ত্যাগান্তে পরলোকে অবস্থিতি করে, আর পরলোক-গতদিগের মধ্যে কতক-

---

(১) নিরাকার বলিলেও ঐশ্বরিক ভাব কিছুই বুঝা যায় না। একারণ "উপাসনা" নামক গ্রন্থে ঈশ্বরের স্বরূপ পাঠ কর।

গুলি আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ আর জন্মগ্রহণ করেন না। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মতে সাকার উপাসনা নাই (২), যোগ-সাধন নাই, জাতিভেদ নাই, এবং নির্ব্বাণ (ঈশ্বরে লীন হওয়া) নাই (৩)। ইহার মতে গুণসাধন সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা ও গুণের অভ্যাস একমাত্রকার্য্য। এই ধর্ম্মানুসারে জগতের সমস্ত নর নারীকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়. এই অভেদ ভাব অবশেষে সমস্ত চেতন পদার্থে পরিণত হয়। এই ধর্ম্ম অবলম্বনার্থে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ আশ্রমের বিশেষ কোন আশ্রম প্রয়োজনীয় নহে, সকল আশ্রমীই ইহা অবলম্বন করিতে পারেন। সত্যধর্ম্মের আশ্রম হৃদয়, যাহাতে পরমাত্মা আসীন থাকেন। আশ্রম গ্রহণ কর বলিলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে জগদীশ্বরকে স্থান দেও। যে নিরাশ্রমী, তাহার হৃদয় নাই, তাহাতে পরমাত্মা বসিতে পারেন না, কেবল উপরি উপরি রক্ষা করেন, কিন্তু পরিত্যাগ করেন না।

(২) সাকারের উপাসনা নাই, কিন্তু অর্চ্চনা আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "উপাসনা" নামক গ্রন্থে দেখ।

(৩) স্ব-প্রযত্নে যে কেহ লীন হইতে পারে না ইহাই ইহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরেচ্ছা হইলে সকলেই তাঁহাতে লীন হইতে পারে।

সম্প্রতি বক্তব্য এই—সত্যধর্ম্ম যে পৃথিবীর সমস্ত প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্য ও উৎকৃষ্টতম, তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে কেবল উহা যে অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা বিভিন্ন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

১। সত্যধর্ম্মে সাকার উপাসনা নাই, সুতরাং সমস্ত সাকারবাদপূর্ণ ধর্ম্ম হইতে ইহা বিভিন্ন।

২। ইহাতে হঠযোগাদির ন্যায় কোনও প্রকার যোগ-সাধনা নাই, এবং পদ্মাসনাদির ন্যায় কোনও প্রকার আসন-সিদ্ধিও নাই, সুতরাং ইহা সমস্ত যোগ-সাধন ধর্ম্ম ও আসনসাধন ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন।

৩। নিরাকারবাদী বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম ও স্বল্প-কালপ্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতেও ইহা বিভিন্ন। কারণ বেদান্তের অতি ভীষণ অহঙ্কারময় অন্যায্য “সোঽহং”-প্রভৃতি ভাবেও ইহা দূষিত নহে, এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় “একবার মাত্র মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে” ইত্যাদি অদূর-দর্শিতায়ও ইহা মহত্ত্ব শূন্য নহে।

৪। পরম পিতার সহিত “পুত্র ও পবিত্র আত্মার” অভেদজ্ঞান প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এবং পুনর্জন্ম অস্বীকার প্রভৃতি নিবন্ধন খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম ইহা হইতে

বিভিন্ন। মহম্মদীয় ধর্ম্মে নরহত্যারও বিধি দেয়, সত্যধর্ম্ম হত নরকে জীবন দান করেন।

৫। বৌদ্ধেরা যদিও পরম সত্য অহিংসাবিষয়ে সত্যধর্ম্মের কিঞ্চিৎ নিকটস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান, পরলোক ও মুক্তি প্রভৃতির পরিস্ফুট বোধ এবং উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত দূরগত ও নিম্নস্থিত। সুতরাং সত্যধর্ম্ম উহা অপেক্ষাও বিভিন্ন।

৬। সত্যধর্ম্ম আধুনিক "থিয়জফিষ্ট-ধর্ম্ম" হইতেও বিভিন্ন। কারণ পরলোক ও পুনর্জন্মাদি বিষয়ে ইহার সহিত ঐক্য নাই। আর থিয়জফিষ্ট-ধর্ম্মে কোন কোন গুণের উন্নতির বিধি থাকিলেও, উহা "সোঽহং" এই ভীষণতম অহঙ্কারপূর্ণ ভাবে কলুষিত।

৭। সত্যধর্ম্ম সাধারণ আত্মাকর্ষণ (আমেরিকাদি-মহাদেশে প্রচলিত স্পিরিচুয়ালিষ্ট) ধর্ম্ম অপেক্ষাও বিভিন্ন। কারণ ঐ ধর্ম্মে অত্যুন্নত মহাত্মাদিগের উপদেশ নাই, কেবল কতকগুলি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সাদৃশ্য-প্রদর্শন মাত্র আছে।

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ইহা বিশদরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "সত্য-ধর্ম্ম" অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতার

ও সত্যতার বিষয়ও আনুষঙ্গিকরূপে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ১ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে। এক্ষণে ধর্ম্মার্থী সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি তোমাদিগের এ ধর্ম্ম অন্য কোনও প্রচলিত ধর্ম্মতুল্য অকিঞ্চিৎকর নহে, তবে তোমরা ইহা—এই অমূল্য রত্ন কিরূপে কোথা হইতে পাইয়াছ? এই প্রশ্নের উত্তরদান এই মুখবন্ধের আর একটি উদ্দেশ্য।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমরা আত্মাকর্ষণরূপ উৎকৃষ্ট উপায় দ্বারা পারলৌকিক মহাত্মাদিগের নিকট হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি*। যেমন প্রদীপ হইতে যে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সামান্য ও সহজে নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু সূর্য্যের আলোক বিশ্বব্যাপী ও অনির্ব্বাপণীয়, তদ্রূপ কালে জগতের সমস্ত ধর্ম্মার্থীর হৃদয় হইতে অন্যান্য ধর্ম্মপ্রদীপ (যাহাও এই সত্য ধর্ম্মের অংশের কণিকা স্বরূপ) নির্ব্বাপিত হইয়া দূরীকৃত হইবে; এবং সত্যধর্ম্মরূপ মহা জ্যোতিঃ চিরবিরাজিত থাকিবে।

ওঁং

---

* যে সকল পারলৌকিক আত্মারা অনন্তগুণধাম পরমপিতার সান্নিধ্যনিবন্ধন অতুল আত্মপ্রসাদ-সাগরে ভাসমান, তাঁহাদিগকে পারলৌকিক মহাত্মা কহে।

সত্য-ধর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সত্যধর্ম্ম কাহাকে কহে ?
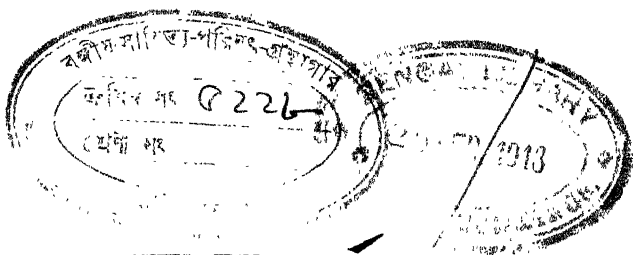
১। যে ধর্ম্ম সত্য অর্থাৎ নিত্যকাল—অনন্তকাল বিদ্যমান ছিল, আছে ও থাকিবে; যে ধর্ম্ম সত্য অর্থাৎ যথার্থ বিষয় সমূহে পরিপূর্ণ; যে ধর্ম্ম সত্য অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরম পিতার একমাত্র অভিপ্রেত এবং যে ধর্ম্ম সত্য অর্থাৎ অসৎকে সৎ করে তাহাকেই সত্যধর্ম্ম কহে।

পরমপিতা স্বীয় অংশ জড় জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, এই সংযুক্ত তদীয় অংশকে জীবাত্মা কহে। জীবাত্মার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিষয় আছে, তৎসমুদায় পাপ ও পুণ্যে মিশ্রিত, জীবাত্মার কর্ত্তব্য এই যে, স্বয়ং নিষ্পাপ হইয়া, ঐ সমস্ত বিষয়ের পাপাংশ যাহাতে স্পর্শ না করে, কেবল পুণ্য অংশ যাহাতে তিনি লাভ করিতে পারেন, এরূপ পথে নিয়ত গমন করেন। এই পথ জগতে আর নাই, সত্যধর্ম্ম ভিন্ন এ পথ কেহ কখনও দেখায়ও নাই এবং দেখাইবার কাহারও শক্তিও নাই। এই পথ লাভের উপায় ঈশ্বরের উপাসনা ও গুণ সাধন। (এই দুইটি বিষয় পশ্চাৎ ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।)

সত্যধর্ম্মের সত্যতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা।

২। (ক) সাকার উপাসনা—পরমপিতা জড় জগতের সহিত তাঁহার অংশ সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঐ সৃষ্টি হইতে নির্লিপ্তভাবে বিভিন্ন আছেন, সুতরাং আকারবিশিষ্ট যাহাই ধর না কেন, তাহাই জড় জগতের সহিত সংযুক্ত হইবেই হইবে। এজন্য উহা কখনই সেই অনন্তশক্তি অনাদি অনন্ত নহে। অতএব আকার বিশিষ্ট বা সাকারের উপাসনা করিলে কখনই পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করা হয় না। এ নিমিত্ত সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে যে সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য নহে।

হিন্দুধর্ম্মের শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতে সাকার উপাসনার বিধি আছে। কিন্তু ঐ সকল মতাবলম্বীরাও ইহা স্বীকার করেন যে, পরমাত্মা সাকার নহেন। পরন্তু "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের—নিরাকার পরমাত্মার রূপ কল্পনা করা হয়। তাঁহারা বলেন, নিরাকারভাব সকলে ধারণা করিতে পারে না, এজন্য নিকৃষ্ট-চেতা উপাসকদিগের হিতের নিমিত্তই সেই নিরাকার পরম ব্রহ্মেরও রূপ কল্পিত হইল। কিন্তু যাহা কল্পনা, তাহা যে সত্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য। আরও দেখ, তাঁহাদিগের এক প্রধান ভ্রম এই যে, তাঁহারা বলেন—"প্রথমে সাকার দেবদেবীর উপাসনা করিলে জ্ঞানযোগ হয়, সেই জ্ঞানযোগ ব্যতীত মনুষ্য কখনও নিরাকার ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারে না।"

(খ) কি হঠযোগ, কি রাজযোগ, কি অন্যবিধ যোগ, সকলেরই উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা-সাধন। যখন পরমপিতার প্রতি প্রেম করিতে পারিলেই আত্মার একাগ্রতা জন্মে, তখন ঐ বিষয়ের যে কোনও প্রয়োজন নাই, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কেননা শতবর্ষ যোগসাধনা করিয়া যেরূপ একাগ্রতা হয়, এক মুহূর্ত্তের প্রেমে তদপেক্ষা সহস্রগুণে

একাগ্রতা জন্মে। আরও দেখ, শেষোক্ত উপায়ে কার্য্য করিলে একাগ্রতা ব্যতীত পাপমুক্তি প্রভৃতি লাভও হয়।

(গ) কতকগুলি লোক আসনসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু উহারও আবশ্যকতা নাই, কারণ উহাও যোগেরই অন্তর্গত। দেখ, অমূল্যরত্ন হীরকমণি-মাণিক্যাদি লাভে যেমন সামান্য অর্থের অভাব থাকে না, তদ্রূপ সত্যধর্ম্ম লাভ হইলে আর ঐ সকলের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না।

(ঘ) নিরাকারবাদপূর্ণ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অপেক্ষাও সত্যধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও সত্য, কেননা বেদান্তে ব্রহ্মকে নিরাকার স্বীকার করিলেও "তত্ত্বমসি," "সোঽহং" প্রভৃতি ঘোরতর অহঙ্কারময় অন্যায্য বাক্য থাকাতে ও উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি না থাকাতে উহা অসত্য ও সত্যস্বরূপ লাভের অনুপযুক্ত। থিয়জফিষ্ট ও যোগসাধকেরাও "সোঽহং" মতাবলম্বী। সুতরাং ঐ ভয়ানক মতের খণ্ডনার্থে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

হে ক্ষুদ্র! হে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র মানব! তুমি যখন অপর এক বা একাধিক মানবকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিতে পার না, তখন সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে কিরূপে আত্মতুল্য বোধ করিবে? হে ক্ষুদ্রতম প্রস্তরকণা! তুমি কিরূপে ও কোন্ সাহসে অনন্ত হিমাচলকে আত্মসদৃশ বিবেচনা করিবে? হে ক্ষুদ্র মানব! যখন তুমি তোমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত কোনও আত্মাকে কস্মিন্ কালে আত্মতুল্যবোধে সমর্থ নহ, তখন তোমা অপেক্ষা অনন্তগুণে উন্নত পরম পিতাকে কিরূপে আত্মতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহস কর?

মনুষ্য যতই উন্নত হউক, কখনও পরম পিতায় লীন হয় না। যেমন বৃত্ত ক্ষেত্র মধ্যে যত প্রকার নিয়মিত সরল রৈখিক ক্ষেত্র থাকিতে পারে, তন্মধ্যে নিয়মিত ত্রিভুজ ক্ষেত্র অল্প সংখক বাহুবিশিষ্ট ও অল্পস্থানব্যাপী,

তদ্রূপ পরম পিতার সৃষ্টিতে যত প্রকার পদার্থ আছে, তন্মধ্যে তোমাদিগের দৃশ্যমান এই স্থূল জগৎ পরলোক অপেক্ষা অল্পতর গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত। যেমন বৃত্তমধ্যস্থ সমচতুর্ভুজ, সম পঞ্চভুজ, সম ষড়্ভুজ, সম শতভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্র ক্রমশঃ উক্ত ত্রিভুজ অপেক্ষা অধিক বাহুবিশিষ্ট ও অধিক স্থানব্যাপী, সুতরাং বৃত্তের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী, তদ্রূপ পারলৌকিক উন্নত আত্মাদিগের দেহও* চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, শত ইত্যাদি সংখ্যক গুণবিশিষ্ট, এবং তাঁহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন ও পরম পিতার অধিক নিকটবর্ত্তী। কিন্তু যেমন বৃত্তমধ্যস্থিত নিয়মিত সরল রৈখিক ক্ষেত্রের বাহুসংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন, উহা কখনই বৃত্তের সমান হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মাও যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, কখনই পরম পিতার তুল্য হইতে পারে না।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যদি নিব্বাণ না হইল, অর্থাৎ যদি জীবাত্মা কখনও পরমাত্মার তুল্য হইতে না পারিল, প্রত্যুত অনন্তকাল অনন্ত ক্ষুদ্রভাবে তাঁহার নিকটে রহিল, তবে কখনও সে পরমাত্মাতে লীন হইতে পারিবে না।

(ঙ) থিয়জফিষ্ট ধর্ম্মে যদিও গুণের উন্নতির বিধি আছে. কিন্তু উহাও "সোঽহং" এই অসীম অহঙ্কার পূর্ণ অন্যায্যভাবে—মলিনভাবে কলুষিত এবং উপাসনা প্রভৃতির প্রকৃষ্ট উপায় না থাকাতে হীনতর।

(চ) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ নিরীশ্বরবাদপূর্ণ, ২য় ভাগ লামা প্রভৃতির অর্চ্চনার নিমিত্ত পৌত্তলিক ধর্ম্ম-সদৃশ এবং ৩য় ভাগ পরলোক ও পারলৌকিক আত্মাদিগের অস্বীকারপূর্ব্বক

---

*পারলৌকিক আত্মাদিগেরও দেহ আছে, উহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এইমাত্র প্রভেদ। এ বিষয় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

কেবল নির্ব্বাণ লাভার্থে চীৎকারপূর্ণ। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম সত্য নহে। কারণ উহার প্রথম ভাগের বিষয়ে অধিক তর্কের প্রয়োজন নাই, মনুষ্যমাত্রেরই যে সহজ জ্ঞান আছে, উহা তাহার বিরোধী, সুতরাং ভ্রান্ত। ২য় ভাগ যে অসত্য, তাহা পৌত্তলিক ধর্ম্মের অসত্যতা বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই উপলব্ধ হইবে। এবং ৩য় ভাগের মূল মতই যে, অসত্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বেদান্ত ধর্ম্মের অসত্যতা প্রতিপাদন সময়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত মতই যে অসত্য, তাহা প্রতিপন্ন হইল। "সমস্ত মতই যে অসত্য" একথা বলাতে কেহই যেন এরূপ ভাবেন না যে বৌদ্ধধর্ম্মে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ইত্যাদি নীতি-বিষয়ক যে সকল উপদেশ আছে, তাহাও অসত্য। বস্তুতঃ কোনও ধর্ম্মের সমস্ত মত অসত্য নহে (বিশেষতঃ নীতিবিষয়ক)। তবে যে ভিত্তির উপরে ঐ মত গ্রথিত থাকে, অথবা যাহা ঐ ধর্ম্মের প্রধান বিষয়, তাহা সমস্ত বা ব্যস্তভাবে অসত্য হইলেই ঐ ধর্ম্মকে অসত্য বলা যায়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, বুদ্ধদেব যে অভিপ্রায়ে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি-লেন, ভবিষ্যতের লোকেরা সেই অভিপ্রায় ভুলিয়া নূতন মত চালাইয়াছে।

(ছ) খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম।—এই ধর্ম্মে পরম পিতার সহিত পুত্র ও পবিত্র আত্মার অভেদভাব কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা কখনও হইতে পারে না। অপর, এই ধর্ম্মে সূক্ষ্ম-জ্ঞানের বিষয় কিছুই উল্লিখিত নাই, এই দুই কারণবশতঃ প্রচলিত খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম ঐকদেশিক।

(জ) মহম্মদীয়-ধর্ম্ম।—এই ধর্ম্মেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ন্যায় ঐকদেশিকতা দৃষ্ট হয়, অধিকন্তু বিধর্ম্মীদিগের প্রাণনাশে ধর্ম্মলাভ প্রভৃতি কতকগুলি আসুরিক নিয়মও প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহাকে সত্য বলা যায় না।

(ঝ) ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।—এই ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা নাই, ইহাই ইহার একমাত্র গুণ। পরন্তু ইহাতে প্রকৃত উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত নাই এবং এই

ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রকৃত উপাসনার অভাবে সূক্ষ্ম জগতের কোনও বিষয় জানিতে পারেন না, এবং জড়জগতের সূক্ষ্মবিষয় পরিজ্ঞানেও অসমর্থ। তজ্জন্যই ইহাঁরা পুনর্জন্মাদি স্বীকার করেন না। আর, যে গুরু না হইলে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, ইহাঁরা ধর্ম্মশিক্ষার্থে সেই গুরুস্বীকার করেন না।। এজন্য ইহাও ঐকদেশিক ধর্ম্ম, প্রকৃত ধর্ম্ম নহে।

(ঞ) স্পিরিচুয়ালিষ্ট-ধর্ম্ম। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যে আত্মাকর্ষণের বিষয় প্রকাশিত আছে, তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ও সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ তাঁহারা অত্যুন্নত মহাত্মাদিগের উপদেশ না পাওয়াতে প্রকৃত জ্ঞানের—প্রকৃত ধর্ম্মের বিষয়ে সবিশেষ জানিতে পারেন নাই। এজন্যই তাঁহাদিগের গ্রন্থে কোন গূঢ় উপদেশ নাই। এজন্য উহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে, ঐকদেশিক ধর্ম্ম।

উপরিভাগে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের অসত্যতা ও ঐকদেশিকতা প্রদর্শন-কালে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সত্যধর্ম্ম উহাদিগের কোনওটীর ন্যায় ঐকদেশিক নহে এবং ঐ সকল ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তি আছে, তাহাও ইহাতে নাই, সুতরাং ইহা সত্য।

সত্যধর্ম্ম যে ঐকদেশিক নহে, প্রত্যুত সর্ব্বাঙ্গবিশুদ্ধ ও অপর সমস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্যাপক, তাহার প্রমাণ এই—

১। অন্যান্য ধর্ম্ম পৃথিবীর মধ্যে যে সকল ভাব আছে, কেবল তাহাতেই বদ্ধ। কিন্তু সত্য ধর্ম্ম অসীম ভাবে বিস্তৃত। ইহা পৃথিবীকে অতি তুচ্ছ বোধ করে এবং ইহা পরলোক ও পারলৌকিক আত্মা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা প্রধান। দেখ, হিন্দুধর্ম্মাদিতে যে অষ্ট-সিদ্ধির উল্লেখ আছে, তাহা পৃথিবীমধ্যস্থ, কিন্তু সত্যধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্মে ইহ লোকস্থ হইয়াও পরলোকে গমন ও তথাকার বিষয় পরিজ্ঞানরূপ মহত্ত্ব নাই।

২। অন্যান্য ধর্ম্ম পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অন্ধবৎ আর কিছু দেখিতে না পাইয়া একেবারে নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু সত্যধর্ম্ম তদ্রূপ নহে। উহা পরম পিতার ক্রমময়-সৃষ্টির ন্যায় ক্রমে ক্রমে অসীম জ্ঞানমার্গপ্রদর্শক ও ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অসীমরূপে প্রসারিত।

৩। অন্যান্য ধর্ম্মে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। উহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি পুরাতত্ত্বের, কোন কোনটী জ্যোতিষ শাস্ত্রের এবং কোন কোনটী বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন। কিন্তু সত্যধর্ম্ম তদ্রূপ নহে। উহাতে সমস্ত শাস্ত্রের ও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সুচারু মীমাংসা আছে।

৪। অন্যান্য ধর্ম্মে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় আছে, এই ধর্ম্মে তৎসমুদায়ই আছে, কিন্তু ইহাতে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় আছে, অন্য কোনও ধর্ম্মে তাহা নাই। কপিলের শাপে সগরপুত্রগণের বিনাশ, ভগীরথের অদ্ভুত উৎপত্তি ও অস্থিপ্রাপ্তি এবং গঙ্গার আনয়নদ্বারা সগর-পুত্রদিগের উদ্ধার প্রভৃতি যে সকল হিন্দুধর্ম্মে আছে এবং ৫ খানি রুটিদ্বারা বহু লোকের ভোজন সম্পাদন এবং ভুক্তাবশিষ্ট রুটির সংখ্যা শতাধিক গণনা ইত্যাদি যে সকল কথা খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মে আছে, এক মাত্র সত্যধর্ম্মে তৎসমুদায়ের মীমাংসা আছে। (বাক্‌সিদ্ধি প্রকরণ দেখ)। কিন্তু অন্য কোনও ধর্ম্মে ঐরূপ সামঞ্জস্য নাই। ইত্যাদি।

৫। অন্যান্য ধর্ম্ম ক্রমশূন্য ও একদেশদর্শী, কিন্তু সত্যধর্ম্ম ক্রমপূর্ণ ও সর্ব্বদর্শী। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাদিতে পাপমুক্তিই অন্তিম ফল, কিন্তু তাহাও যে কি উপায়ে হইতে পারে, তাহারও বিশেষ বিবরণ নাই। যোগসাধন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মতে পাপ ও পুণ্যই নাই, অথচ ঐ দুইটী ধর্ম্ম নির্ব্বাণ এই ভীষণ চীৎকাররবে মিশ্রিত, সুতরাং উন্নতিলাভের জন্য উহারা কতিপয় শুষ্ক জ্ঞানের উপর মাত্র নির্ভর করে। আত্মাকর্ষণ, পাপগ্রহণ, বিবিধ

সিদ্ধি লাভ ও আয়ুঃপ্রদানশক্তি এই সকল প্রধান বিষয়ের যথাযথ বিবরণ সত্যধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মে নাইঁ। খৃষ্টান ধর্ম্মে একমাত্র পাপগ্রহণের কিছু উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহাও অন্যের কিরূপে হয়, তাহা নাই। হিন্দুধর্ম্মে একমাত্র সিদ্ধির কথা আছে বটে, কিন্তু তাহাও পূর্ব্বানুরূপ স্থূল ভাবে বদ্ধ। অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মে এ বিষয়ের কিছুই নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই সকল বিষয় হইতে জানা যাইতেছে যে সত্য-ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পারলৌকিক মহাত্মাদিগের নিকট হইতে আমরা এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং তাঁহারাই এই ধর্ম্মের প্রচারক।

যে ব্যক্তির প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা, একাগ্রতা, ভক্তি ও ঈশ্বরজ্ঞান আছে এবং যাহার মন কুপথে গমন করে না, পারলৌকিক আত্মারা তাহাকে আশ্রয় করিতে ও স্ব স্ব মন্তব্য জানাইতে পারেন। কিন্তু কেবল উক্ত গুণ গুলি থাকিলেই পারলৌকিক মহাত্মারা কোনও ব্যক্তির দেহ আশ্রয় করেন না। যে ব্যক্তির উল্লিখিত গুণসমূহ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত গুণগুলিও আছে, পারলৌকিক মহাত্মারা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

গুণ যথা—

(৮)—সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা।

(৯)—নিষ্পাপ অবস্থা বা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা।

(১০)—অন্যদীয় পাপগ্রহণ ক্ষমতা।

(১১)—লোকের উপকার ভিন্ন অপকার করিব না, এই বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয়তা।

(১২)—সিদ্ধিসমূহ লাভের উপযুক্ত গুণ।

(১৩)—কাম-ক্রোধহীনতা।

(১৪)—অন্ততঃ সমস্ত মনুষ্যকে সহোদরবৎ দর্শন ও তদনুরূপ আচরণ করা।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পারলৌকিক মহাত্মারা যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা অবশ্যই অভ্রান্ত, কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের এত সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের হৃদয়ে আর ভ্রান্তি যাইতে পারে না। সুতরাং সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, অন্ধ জগৎ আপনার আত্মার উৎকর্ষে যাহা জানিয়াছে, তাহা অপেক্ষা,—পারলৌকিক মহাত্মাদিগের দ্বারা যাহা জানা যাইতেছে, তাহা সত্য, সত্য সত্য !!! সুতরাং সত্যধর্ম্ম যে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাঙ্গবিশুদ্ধ ও সত্য, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই !!!

ওঁং

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যধর্ম্মের সার কি ?

১। সত্যধর্ম্মের বিষয়ে মুখবন্ধে ও প্রথম পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই এ ধর্ম্মের মত প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার সার অংশ লিখিত হইতেছে।

(১)—মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন।

(২)—জীবাত্মার বিনাশ সাধন বা পরমাত্মার জীবত্ব বিনাশ সাধন।

(৩)—ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তন সাধন।

(১)—যখন মনুষ্য প্রেমানন্দময় পরম পিতার প্রেম-সুধাপানে আনন্দসাগরে মগ্ন হয়, তখনই মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

(২)—পাশমুক্ত হইলেই জীবত্ব বিনাশ সাধন হয়।

(৩)—উপরি উক্ত অবস্থাদ্বয়ের পরে, যখন দেহাবচ্ছিন্ন পরমাত্মার জীবত্ব ধ্বংস হইল, অথচ পূর্ণতা হইল না, তখন তিনি ক্রমশঃই পূর্ণস্বরূপ অনাদি অনন্তের নিকটবর্ত্তিতা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ ক্রমশঃই পূর্ণত্ব পাইতে থাকেন। ইহাকেই ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তন সাধন শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, ঐরূপে আত্মা উন্নতি লাভ করিয়া অনন্তকালেও স্বপ্রযত্নে পূর্ণ পূর্ণত্ব পাইতে পারে না। মনে কর উল্লিখিত গুণসম্পন্ন আত্মা যেন ·৯ হইতে অনন্তকাল উন্নতি দ্বারা ক্রমশঃ ·৯৯, ·৯৯৯, ·৯৯৯৯ ইত্যাদিরূপে ·৯· হইল। কিন্তু উহাও যে ১ হইতে ক্ষুদ্রতর, তাহার প্রমাণ এই—

১·০০০০০০

·৯৯৯৯৯৯ ...... ইত্যাদি অনন্ত সংখ্যক।

·০০০০০০১ [ইত্যাদি (অনন্ত—১) সংখ্যক শূন্য] ১

২। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল গুণবিশিষ্ট হইলে, পারলৌকিক

কি উপায়ে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায়।

মহাত্মাদিগের নিকট হইতে এই ধর্ম্ম লাভ করা যায়। কিন্তু ঐ সকল গুণ সাধারণের লাভ করা দূরে থাকুক, ভূমণ্ডলে কোটি কোটি বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ ২।১ জনে লাভ করিতে পারেন। এজন্য কেবল পূর্ব্ব উপায়ে এই ধর্ম্ম সাধারণের সুপ্রাপ্য নহে। অথচ অনন্ত করুণাময় পরম পিতার ইচ্ছা এই যে, এই ধর্ম্ম সাধারণের সুপ্রাপ্য হয়। এ জন্যই উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সাধকের প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত প্রচারকেরা

ভারপ্রাপ্ত সাধকের নিকটবর্ত্তী হইয়া, জনসমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উল্লিখিত সাধকের নিকট হইতে যাঁহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের নিম্নলিখিত গুণ গুলি থাকা আবশ্যক। ধর্ম্মার্থীর গুণ যথা—

(১)—সহজ জ্ঞান।

(২)—নির্ভরতা অর্থাৎ পরম পিতা যাহা করিতেছেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই হইতেছে। তিনি অনন্ত কালেও কখনও অমঙ্গল বিধান করিবেন না।

(৩)—বিশ্বাস অর্থাৎ তিনিই আমার সমুদায়।

উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট হইয়া, (পারলৌকিক মহাত্মারা যাঁহাকে এই ধর্ম্মের যাবতীয় মর্ম্ম জ্ঞাপিত করিয়াছেন এবং গুণরাশি দর্শনে যাঁহাকে প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, প্রথমে পারলৌকিক মহাত্মারা, পশ্চাৎ স্বয়ং পরম পিতা এই ধর্ম্ম প্রচারার্থে অনুমতি করিয়াছেন,) সেই সাধকের নিকটে বা তদাদিষ্ট ব্যক্তির নিকটে দীক্ষিত হইলেই এই ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায়। দীক্ষিত হইবার নিয়ম পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

কি কি উপায়ে সত্য-ধর্ম্ম-পথে থাকা যায়?

৩। যে তিনটী গুণবিশিষ্ট হইলে, সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করা যায়, তাহা বিনষ্ট না হইলে এবং রীতিমত উপাসনা করিলে এই ধর্ম্মে থাকা যায়। দেখ, উপাসনা জীবনের অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়। উপাসনা ব্যতীত সত্যধর্ম্ম-পথে অবস্থিতির আর উপায় নাই। যে ব্যক্তি উপাসনা করে নাই, তাহার পাপ জীবন পশুভাব বিহীন হইয়া কখনও প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি উপাসনা করে নাই, সে পাপমুক্তির পরে সুবিমল আত্মপ্রসাদ কি মধুময়—কি অমৃতময় পদার্থ, তাহাও জানিতে পারে নাই, যে ব্যক্তি

উপাসনা করে নাই, তাহার মন কখনও দৃঢ় হয় নাই, যে উপাসনাবিমুখ, সূক্ষ্ম জগতের কথা দূরে থাকুক, সে স্থূল জগতের সূক্ষ্মভাবও জানিতে পারে নাই এবং যে উপাসনা করে না, তাহার আত্মাও নিস্তেজভাবে থাকে। ইত্যাদি। অতএব উপাসনাই বল, উপাসনাই শান্তি। যে এমন ধনে বঞ্চিত, সে যে ধর্ম্মচ্যুত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ???

ওঁং

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপাসনা ও প্রার্থনা।

১। উপাস্যকে আত্মার আভরণ করাকে উপাসনা কহে। উপাসনা দুই অংশে বিভক্ত।

যথা— (১)—পরম পিতার গুণকীর্ত্তন।

(২)—স্বীয় পাপ-উক্তি।

প্রার্থনা তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—

(১)—পাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা।

(২)—গুণের নিমিত্ত প্রার্থনা।

(৩)—ভিক্ষা।

আমার কিছুই নাই, তুমি যাহা কিছু দেও, তাহাই আমার প্রতিপালক। এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করাকে ভিক্ষা কহে।

প্রার্থনার ফল।

(১) পাপ হইতে মুক্তি।

(২) মনের দৃঢ়তা অর্থাৎ প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া পাপকার্য্য সম্পাদন না করা ও পাপকর কার্য্য চিন্তায় মন না যাওয়া।

উপাসনার ফল।

(১) প্রেম প্রভৃতি গুণের উন্নতি।

(২) জড় ও সূক্ষ্ম জগতের সম্বন্ধ জ্ঞান।

(৩) আত্মার সতেজ অবস্থা সম্পাদন।

(৪) পর্য্যায়ক্রমে রোদন ও আহ্লাদ।

সত্যধর্ম্মের দৈনিক উপাসনার নিয়ম।

২। (ক) প্রতিদিন অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা উপাসনা করিবে।

(খ) প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাসময়ে এই বিশেষ প্রার্থনা করিবে যে, "হে করুণাময়, দয়াময় পিতঃ! এই দিন (প্রাতে) বা এই রাত্রি (সন্ধ্যা সময়ে) যেন তোমার প্রীতিকররূপে যাপন করিতে পারি।

(গ) গানাৎ পরতরং নহি, অর্থাৎ উপাসনা গান দ্বারাই উত্তম হয়। অগত্যা সাধারণ কথায় করা কর্ত্তব্য। গুণকীর্ত্তন মহাত্মাদিগের রচিত স্তব দ্বারাও হইতে পারে।

(ঘ) উপাসনার আদিতে ও অন্তে সাধারণতঃ এই বলিবে যে, "ওঁং সত্যং পূর্ণমমৃতং ওঁং"। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কথা বলা আবশ্যক।

(ঙ) (ঘ) নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মনের প্রতি, সদ্ভাবপূর্ণ ২।১টী গান করা কর্ত্তব্য।

গান যথা—(রামপ্রসাদী সুরে।)

মন রে পূজ প্রেমময়ে।
যাহে জীবন সফল, জনম সার্থক,
চিরানন্দ হ'বে হিয়ে।
ভক্তি-প্রেম-ফুলে রে মন, শ্রদ্ধা-চন্দন মিলাইয়ে,
হৃদয়-আসন' পরে পূজ হৃদয়-ভূষণনাথে লয়ে।
নিরন্তর পূজ রে মন, অন্তরে অনন্ত-গুণে,
(ওরে) অগতির গতি সেই অনন্তকাল-সহায়ে।

সত্যধর্ম্মের দৈনিক উপাসনার প্রণালী।

৩। প্রথমে পরম পিতার গুণকীর্ত্তন করিবে। তাঁহার অনন্ত গুণ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্তবে বা গানে কতকগুলির উল্লেখ আছে।

দীননাথ দীনবন্ধু দীনের শরণ, অগতির গতি পিতা অধম তারণ।
দয়াময় কৃপাময় করুণানিধান, তুমি সত্য সনাতন পতিতপাবন।
তুমি হে মঙ্গলময় শান্তি নিকেতন,তুমি শিব তুমি বিভু তুমি হে তারণ।
অনাদি অনন্ত তুমি নিখিল কারণ, অনন্ত জ্ঞান-নিধান হৃদয়-রঞ্জন।
তুমি সর্ব্বব্যাপী প্রভু প্রেমের নিধান, সকলের আদি অন্ত সর্ব্বশক্তিমান।
নিরাকার নির্ব্বিকার কারণ-কারণ, তুমি হে মনের মন প্রাণের পরাণ।
রক্ষকের রক্ষক তুমি ভীষণ-ভীষণ, সকল ভয়ের ভয় ভয়-নিবারণ।
তুমি হে আত্মার আত্মা বিপদভঞ্জন, অনাথের নাথ তুমি চির-আলম্বন।
অতুল জ্যোতির জ্যোতি হৃদয়-মোহন, তব অনুভবে নাথ সুশীতল প্রাণ।
সৃজনপালনকারী কৃপার নিধান, অনন্ত ন্যায়ের ধাম পাপীর শাসন।

অনন্ত গুণনিধান পালিছ ভুবন, তারিয়ে পাপীরে, দিয়ে গুণহীনে গুণ।
মঙ্গল চরণে তব নমি হে তারণ, মঙ্গল চরণে নমি সন্তান পালন।
মঙ্গল চরণে তব নমি গুণ-ধাম, মঙ্গল চরণে নমি অনাদি কারণ।
মঙ্গল চরণে নমি প্রেমের নিধান, মঙ্গল চরণে নমি প্রেমের বিধান।

অন্ততঃ কিঞ্চিৎ একাগ্রতা না হইলে উক্ত স্তবে বা গানে „তুমি" স্থানে "তিনি," "তব" স্থানে "তাঁর," "তব অনুভবে নাথ" স্থানে "তাঁর অনুভবে হয়" এবং "পালিছ" স্থানে "পালেন" বলিয়া বাক্য মিলাইয়া লইবে। আর শেষস্থ ৬টী চরণ ত্যাগ করিবে।

২য়তঃ। গুণকীর্ত্তনের পরে আপন আপন পাপ উল্লেখ করিতে হইবে। পাপসমূহের মধ্যে যেগুলি মনে পড়িবে, সেইগুলি প্রথমে উল্লেখ করিয়া, পরিশেষে সাধারণভাবে অবশিষ্টগুলির উল্লেখ করিতে হইবে। কাম, ক্রোধপ্রভৃতিও পাপের মধ্যে গণ্য, সুতরাং উহাদিগেরও উল্লেখ করিবে।

৩য়তঃ। পরম পিতার গুণকীর্ত্তন ও স্বীয় পাপ উক্তি করিতে করিতে যখন আত্ম-গ্লানি হইবে, তখন পাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিবে। আত্ম-গ্লানি না হইলেও পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে বাধা নাই।

৪র্থতঃ। প্রেম, ভক্তি, নির্ভরভাব, একাগ্রতা প্রভৃতির মধ্যে যেটীর বা যেগুলির অধিক অভাব বোধ হইবে, তাহার বা তৎসমুদায়ের জন্য অগ্রে প্রার্থনা না করিয়া, প্রথমে সাধারণভাবে সমস্ত গুণের জন্য প্রার্থনা করিবে। প্রেম কামনাতীত, সুতরাং একাসনে কোনও কাম্য বিষয় প্রার্থনার সহিত প্রেমের জন্য প্রার্থনা করিবে না।

দীক্ষার প্রয়োজন।

৪। পূর্ব্বোক্ত উপাসনাপ্রণালী অবগত হইলেই যে, সম্পূর্ণরূপে সত্যধর্ম্মাবলম্বী হইল, এমত নহে। সত্যধর্ম্মাবলম্বী হইতে হইলে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। দীক্ষিত বা ঈশ্বরপথাবলম্বী হইবার প্রয়োজন এই যে, স্বশক্তিতে কেহ

কোনও বিষয় জানিতে পারে না, সকল বিষয়েই পরিচালনার্থ বা শিক্ষাদানার্থ এক এক জন গুরুর প্রয়োজন। অতএব দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এবিষয়ের সবিশেষ বিবরণ গুরুতত্ত্বে দেখ।

দীক্ষাদাতা কে?

৫। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই যে, কে দীক্ষিত করিবে? ইহার উত্তর এই যে, পারলৌকিক মহাত্মারাই এই ধর্ম্মের প্রচারক, সুতরাং তাঁহারাই এই ধর্ম্মের দীক্ষাদাতা। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ লোকের নিকটে আসিতে পারেন না। এজন্য যিনি এই ধর্ম্ম প্রকাশার্থে অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই দীক্ষাদাতা। এবং সেই অশেষ গুণভূষিত অশেষ শক্তিসম্পন্ন মহাত্মার আদিষ্ট ব্যক্তিরাও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন। আর তাঁহার অবর্ত্তমানতায় তদীয় সর্ব্বপ্রধান শিষ্যই তাঁহার কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন।

দীক্ষার বিভাগ ও লক্ষণ।

৬। দীক্ষা দুই প্রকার, পারলৌকিক ও ঐহিক। পরলোকের জন্য যে দীক্ষা, তাহাই পারলৌকিক এবং আদিম দেহের নিমিত্ত যে দীক্ষা তাহা ঐহিক বলিয়া কথিত হয়।

দীক্ষার নিয়ম।

৭। সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে, উল্লিখিত দীক্ষাদায়কদিগের নিকটে গিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে দীক্ষিত বা ঈশ্বরপথাবলম্বী হইতে প্রার্থনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে, দীক্ষাদাতা সত্যধর্ম্ম-আকাঙ্ক্ষীকে নিম্নলিখিতরূপে ঈশ্বরপথাবলম্বী বা দীক্ষিত করিবেন। যথা—

ঈশ্বর-পথাবলম্বীর বা দীক্ষার্থীর করযুগল নিজ করে ধারণ করিয়া প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে (যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ক্ষতি নাই,) দীক্ষাদাতা বলিবেন যে, "হে অসীম, অনন্ত গুণধাম প্রভু দয়াময় পিতা! অদ্য আমার সহোদরপ্রতিম (নাম উচ্চারণ) তোমার পথাবলম্বী হইতে ব্যাকুলান্তঃকরণে বাঞ্ছা করাতে, তাহাকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করিলাম।"

অনন্তর উভয়ে পরস্পরের হস্ত চুম্বন করিবেন। এই দীক্ষাকে ঐহিক দীক্ষা কহে। পারলৌকিক দীক্ষাদানকালে দীক্ষাদাতা দীক্ষার্থীকে যাহা বলিবেন, তাহাতে পার্থিব ভাব অত্যল্প থাকিবে।

ওঁং

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ধর্ম্মসাধন কি ?

১। ধর্ম্ম অর্থাৎ পথ; প্রকৃত পথ দেখিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে গমন করাকে ধর্ম্মসাধন কহে।

সাধনা কি ? কিসের সাধনা, সাধনার প্রয়োজন কি ?

২। সাধনা শব্দের অর্থ অভ্যাস করা। গুণ সাধনাই ধর্ম্মার্থীর কর্ত্তব্য। যদিচ উপাসনা দ্বারাই গুণের বৃদ্ধি হয়, তথাচ যথোচিত অভ্যাস না করিলে, কখনই প্রকৃত রূপে গুণের উন্নতি হয় না। অতএব সাধনা অর্থাৎ গুণাভ্যাস নিতান্ত আবশ্যক।

গুণ যথা—প্রেম, ভক্তি, সরলতা ইত্যাদি। যেমন কৃত পাপরাশির মধ্যে অগ্রে গুরুতর অর্থাৎ অধিকতর যাতনাদায়ক পাপগুলি হইতে মুক্তিলাভ করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ গুণসমূহের মধ্যে যে যে গুণ ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠ, তৎসমুদয়ের অভ্যাস বিলোমক্রমে (বিপরীত মতে) করিতে হইবে। যেমন ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি ক্রমে ক্ষ পর্য্যন্ত করিতে হয়, গুণাভ্যাস সেরূপ নহে, উহা ক্ষ, হ, স, ষ, শ ইত্যাদি ক্রমে করা আবশ্যক। অর্থাৎ যে গুণটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কষ্টসাধ্য, তাহার অভ্যাস প্রথমে

করিতে হয়, সুতরাং গুণসমূহের ক্রমের বিপরীতক্রমে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। গুণের মধ্যে যেটীর অধিকার অর্থাৎ ব্যাপকতা অধিক, তাহাকে শ্রেষ্ঠ কহা যায়। যথা প্রেম ব্রহ্মাণ্ডবিস্তীর্ণ, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠতম।

গুণসাধনার ফল গুণলাভ বা গুণবৃদ্ধি করা। গুণসাধনা হইলে, ১মতঃ, জগতের উপকারে সমর্থ হওয়া যায়। ২য়তঃ, ঈশ্বর-সৃষ্ট চেতন পদার্থের প্রতি প্রেম বিস্তার করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করা যায় এবং অনন্ত গুণনিধান অনন্ত আনন্দময় পরম পিতার ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া অনন্ত আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদ লাভে চরিতার্থ হওয়া যায়। কতিপয় প্রধান প্রধান গুণ কিরূপে অভ্যাস করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

যেমন দোষের অননুশীলনই দোষ নিবারণের এক প্রধান উপায়, তদ্রূপ গুণের অনুশীলনই গুণবৃদ্ধির প্রধান উপায়।

প্রেম—পুরুষ সাধুশীলা স্ত্রীকে অবলম্বন এবং সাধুশীলা স্ত্রী সৎপুরুষ অবলম্বন করিয়া প্রেম-গুণাভ্যাস করিবেন। কারণ দাম্পত্য প্রেমই সর্ব্বপ্রেমের মূল। পুরুষ পুরুষকে এবং রমণী রমণীকে অবলম্বন করিয়া প্রণয় বা প্রেম অভ্যাস করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন। করুণরস ও মমতা দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয়। করুণরসাত্মক গ্রন্থ পাঠ করিলে এবং আত্মাকে (অন্য আত্মার সহিত) সমান অবস্থাপন্ন করিতে পারিলেও করুণরসের বৃদ্ধি হয়।

গর্ভধারিণী জননীর ও জন্মদাতা পিতার প্রতি ভক্তি করিয়াই ভক্তি লাভ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভক্তিভাজনদিগের প্রতি ভক্তি করিয়াও ঈশ্বরভক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অন্যান্য ভক্তিভাজন যথা—

সৎপথে পরিচালক গুরু ও আপন অপেক্ষা উন্নত ও বিবিধ উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন আত্মা।

একাগ্রতা—একাগ্রতাদ্বারাই একাগ্রতা জন্মে, অর্থাৎ পরম পিতার উপাসনায় যত একাগ্র হইতে চেষ্টা করিবে, ততই একাগ্রতার বৃদ্ধি হইবে। প্রেম ও ভক্তি হইলে একাগ্র হওয়া যায়। একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য কত লোকে পানদোষাদিতে রত হয়, কিন্তু সেরূপ করা অতি গর্হিত। কতকগুলি লোক এই একটী গুণলাভ করিবার জন্য অন্যান্য বহুবিধ সদ্‌গুণ বিনষ্ট করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়. কিন্তু তাহাও যে কর্ত্তব্য নহে, ইহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ওঁং

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সিদ্ধি কাহাকে কহে ? কোন্ গুণে কোন্ সিদ্ধি হয় ?

১। সাধনার ফলকে সিদ্ধি কহে। যে যে গুণে যে যে সিদ্ধি হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১মতঃ। আত্মাকর্ষণ যে যে গুণবিশিষ্ট হইলে হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

২য়তঃ। অন্যের পাপগ্রহণশক্তি—সরলতা পবিত্রতা প্রভৃতি আত্মাকর্ষণের বা সাধক হইবার সমস্ত গুণ অধিক পরিমাণে হইলে এবং জনসমাজে ঘৃণিত ও ঈশ্বর দৃষ্টিতে উন্নত হওয়া, সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা ও সত্যধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ইত্যাদি গুণ হইলে ঐ শক্তি জন্মে।

৩য়তঃ। বাক্‌সিদ্ধি—যে সিদ্ধিদ্বারা অপরা বিদ্যাদি দান করিবার ক্ষমতা হয় ও বাক্যদ্বারা পাপমুক্ত করিবার (গ্রহণ না করিয়া) ক্ষমতা

জন্মে, তাহাকে বাক্‌সিদ্ধি কহে। সুতরাং বাক্‌সিদ্ধি ৩ প্রকার। ১ম পার্থিব, ২য় স্বর্গীয়, ও ৩য় পার্থিব স্বর্গীয়। এতদ্‌ভিন্ন শুদ্ধ পারলৌকিক বাক্‌সিদ্ধিও আছে, উহা ৩৯৯ শ্রেণীস্থ আত্মারা লাভ করিয়া সিদ্ধ হন। নিরন্তর সত্য কথন ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ থাকিলেই পার্থিব বাক্-সিদ্ধি হয়। ইহা আত্মার সবিশেষ উন্নতি ব্যতীতও হইতে পারে। যে যে গুণে পাপগ্রহণ-শক্তি জন্মে, তাহা অধিক পরিমাণে হইলে এবং "সমুদয়ের উপকার করা, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করা ও সকলের প্রতি ভ্রাতৃবৎ আচরণ করা" এই তিনটী গুণ জন্মিলে স্বর্গীয় বাক্ সিদ্ধি হয়।

৪র্থতঃ। গুটিকাসিদ্ধি—এই সিদ্ধিদ্বারা দেহ লইয়া কতিপয় স্থান ব্যতীত যথা ইচ্ছা নিমিষমাত্রে গমন করা যায়।

৫মতঃ। কীর্ত্তিসিদ্ধি—ইহাতে দেহ হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করা এবং পুনরায় দেহে প্রবেশ করা যায়।

৬ষ্ঠতঃ। অমৃতসিদ্ধি—ইহাতে দেহ হইতে নির্গত হইয়া অন্যের দেহ আশ্রয় করা যায়।

৭মতঃ। অমূলসিদ্ধি—এতদ্দ্বারা দেহ হইতে নির্গত হইয়া চেতন পদার্থের মধ্যে যেটীর ইচ্ছা, সেইটীর ন্যায় দেহ ধারণ করা যায়।

উল্লিখিত সিদ্ধিচতুষ্টয়ও পারলৌকিক বাক্-সিদ্ধির উপযুক্ত গুণ সমূহ অধিক পরিমাণে হইলে হইতে পারে।

৮মতঃ। আয়ুঃ-প্রদান-শক্তি—এই শক্তিদ্বারা স্বীয় আয়ু প্রদান করা যায়, অথবা কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে তাহার আয়ু লইয়া তদীয় অভীষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া যায়।

নিম্নলিখিত গুণসমূহ থাকিলে ঐ শক্তি জন্মে।

১। বাক্‌সিদ্ধি (পারলৌকিক) থাকা আবশ্যক।

২। সরলতা ইত্যাদি আত্মাকর্ষণের গুণ থাকা আবশ্যক।

৩। দুয়ের অধিক লোককে অভেদ-জ্ঞান করা আবশ্যক।

৪। ঈশ্বরের কোন একটী গুণে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।

৫। যখন যে পাপ-গ্রহণ হইবে, তাহা সেই সময়েই কর্ত্তন করার শক্তি থাকা আবশ্যক।

৬। সশরীরে পৃথিবীর যথা ইচ্ছা, তথা ভ্রমণ করার শক্তি থাকা আবশ্যক। (এইটী গুটিকা-সিদ্ধি অপেক্ষাও উন্নত।)

৭। পার্থিব বিষয়ে অনভিমত্ততা থাকা আবশ্যক।

৮। সমস্ত সৃষ্ট মণ্ডলের বাহ্য ও আত্মসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৯। স্ত্রীলোকের পক্ষে সতী ও সাধিকা হওয়া আবশ্যক।

১০। জননীর একমাত্র পুত্র বালস্বভাবসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।
(১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের সন্তানের পক্ষে।)

১১। হিংসাদি সামান্য দোষ হৃদয়ে অনুপস্থিত থাকা আবশ্যক।

১২। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা থাকা আবশ্যক।

মনুষ্যমাত্রেই পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পাপ দ্বারা ঐ আয়ুঃ ক্ষয় হয় অর্থাৎ উহার কিয়দংশ বা সমস্ত ভোগের অনুপযুক্ত হয়, কিন্তু পুণ্যদ্বারা বৃদ্ধি হয় না। পাপক্ষয় হইবার পরে নিষ্পাপ হইলে পুনরায় ঐ আয়ু ভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পুণ্যদ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি হয় না বটে কিন্তু আয়ুর প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। কারণ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন এক মহাত্মার ১ দিনের আয়ু অপরের শতাধিক বৎসরের আয়ুর সমান হইতে পারে। অর্থাৎ উক্ত মহাত্মা তদীয় ১ দিনের আয়ুঃ প্রদান করিলে, ঐ ব্যক্তি শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।

ওঁং

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যমাত্রেরই অসীম দেহ—স্থূলতম (আদিম), স্থূলতর ইত্যাদি এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি। মনুষ্য আদিম বা স্থূলতম দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করে। তথায় কর্ত্তব্য কার্য্যসম্পাদনদ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হয়। পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি অনুসারেই আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। আদিম দেহ ত্যাগের পরে যে যে স্থানে যাইতে হয়, সে সমস্তও সাধারণতঃ পৃথিবীর ন্যায় এক একটী স্থান, কিন্তু ঐ সকল স্থান ক্রমশঃই সূক্ষ্ম। অপর যে সকল ব্যক্তি আদিম দেহেই বহু দেহের কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান, তাঁহারা আদিম দেহত্যাগের পরে একেবারেই অত্যুন্নত স্থানে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্তরূপে অসীম কাল গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্রমশঃ আত্মা অনন্ত গুণধাম পরম পিতার নিকটবর্ত্তী হয়, ও অতুল আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কখনই লীন হয় না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইবে যে পরলোকে সকল আত্মা সমান স্থানে অবস্থিতি করেন না। বস্তুতঃও তাহাই। যাঁহারা উন্নত, তাঁহারা উচ্চতর ও সুখময় স্থানে ও যাঁহারা অবনত, তাঁহারা নিম্নতর ও ক্লেশময় স্থানে বাস করেন। সূর্য্যমণ্ডলের ও পৃথিবীর কেন্দ্র সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দু হইতে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশরূপে রেখাপাত করিয়া উচ্চতা ও নিম্নতা স্থির করিতে হইবে।

একবিধ উন্নত আত্মারা পরলোকে যে যে স্থানে থাকেন, তাহাকে এক একটী শ্রেণী কহে। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রথম অবধি কতকগুলি শ্রেণীকে নরক বলা যায়। কিন্তু ঐ স্থানসমূহ একের পক্ষে নরক হইলেও অন্য কোন মণ্ডলবাসীর পক্ষে স্বর্গ হইলেও হইতে পারে। নরক ভিন্ন সমস্ত শ্রেণী গুলিই স্বর্গ।

পরলোকগত আত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকেই পুনর্জন্ম কহে। পুনর্জন্ম সকল আত্মারই যে হইবে, এরূপ নহে, উহা আত্মাদিগের স্ব স্ব ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে সকল ব্যক্তি আয়ুঃসত্ত্বে আদিম দেহ ত্যাগ করেন, অথবা যে সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণ আয়ুঃ ভোগ করিয়া গমন করিয়াও উপায়বিশেষ দ্বারা পরলোকে আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগেরই পুনর্জন্ম হইতে পারে। অন্য কাহারও হইতে পারে না। আর আয়ুর্বিশিষ্ট বা আয়ুঃপ্রাপ্ত মাত্রেরই যে পুনর্জন্ম হইবে, তাহাও নহে। যে সকল আত্মা পরলোকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম (পাপক্ষয় ও গুণসাধন) করিয়া উঠিতে পারেন না, অথবা যাঁহারা পরলোকে গুণের অভাব প্রভৃতি নিবন্ধন অধীর হন, সাধারণতঃ তাঁহারাই পুনর্জন্ম লইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন উন্নত আত্মারাও কখনও কখনও সবিশেষ কারণবশতঃ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং পুনর্জন্মের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, উহা আত্মাদিগের ইচ্ছাধীন।

পুনর্জন্ম কি ?
উহা কাহার হয় ?

ওঁং

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১। যাহাতে অপরের মনে কষ্ট হয়, সুতরাং সহানুভূতি দ্বারা তোমারও হয়, তাহাকে পাপ বলে।

পাপ কাহাকে কহে ?

যে আত্মা যত পাপভারে আক্রান্ত, তাহারই পাপকর কার্য্যে তত অল্প ক্লেশ বোধ হয়, সুতরাং লঘুতর পাপে ঘোর পাপীদিগের যে ক্লেশ হয়,

তাহা তাহারা অনুভবনীয়রূপে বোধ করিতে পারে না। এমন কি সাতি-শয় পাপরাশিতে অভিভূত হইলে, গুরুতর পাপের ক্লেশও অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং একবার নিষ্পাপ হইতে না পারিলে আর সমস্ত পাপ অনুভব করিবার শক্তি জন্মে না।

২। জগতে সকল ব্যক্তি সকল কার্য্যে সমান অধিকারী নহে।

পাপ কিরূপে হয়?

দেখ, যে মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত শিশুর জীবন রক্ষা সুকঠিন, সেই মাতৃদুগ্ধ আবার যুবার পানীয় নহে। অপর, যুবা যে মৎস্য মাংসাদি দ্বারা শরীর সবল করিয়া থাকেন, শিশুর পক্ষে তাহা ভক্ষণীয়ই নহে। অন্যদিকে দেখ, যে ব্যক্তি বহুকাল আকরের অন্ধকার-ময় স্থানে বাস করে, একেবারে সূর্য্যালোকে-সমুদ্ভাসিত স্থানে উন্মীলিতনেত্রে গমন, তাহার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ তথায় গমন করিলেও তাহাকে নিমীলিতনেত্রে থাকিতে হইবে; অপর, নিরন্তর আলোকরাশিতে ভ্রমণ-শীলও যদি অন্ধকারময় স্থানে গমন করেন, তবে তিনিও প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইবেন না। ইত্যাদি। বিষয়ান্তরে দেখ, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, অসুস্থের পক্ষে তাহা অকর্ত্তব্য। সুস্থদিগের মধ্যেও ক্ষমতাবিশেষে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করা উচিত। বস্তুতঃও যে ব্যক্তির যতদূর ক্ষমতা আছে, তদনুরূপ কার্য্য না করিলে বা তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিলেই জীবাত্মার কষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সমস্তই পাপ। এই রূপেই জীবাত্মার পাপ হয়।

প্রথমতঃ, জন্মগ্রহণকালে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং মাতা, মাতামহ ও প্রমাতামহ এই সাত জনের ও পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতি পাঁচ জনের যত পাপ থাকে, তত পাপ স্বীকার করিয়া গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হয়। কিন্তু যদি সৌভাগ্যক্রমে মাতা পিতা নিষ্পাপ অর্থাৎ পূর্ব্বতনগণের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। তবে গর্ভস্থের পূর্ব্বোক্ত

পাপ হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগের যদি অন্য পাপ থাকে, তবে তাহা হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বকৃত পাপ অর্থাৎ পাপকর কার্য্য সম্পাদনে যে পাপ হয়, তাহাই। এই দুই প্রকারে এবং কতিপয় সূক্ষ্মকারণে পাপস্পর্শ হয়।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৩। পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত আত্মগ্লানি। যেমন পাপ, তদ্রূপ আত্মগ্লানি হওয়া আবশ্যক। নতুবা পাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হয় না। মনে কর, আত্মা তৈল ও সল্‌তাদ্বারা জ্বালিত দীপ। (মৃৎপাত্রটী যেন অসীমরূপে বিস্তৃত হইতে পারে অর্থাৎ উহার এরূপ নির্ম্মাণ যে, যত তরল দ্রব্যই উহাতে দেও না কেন, ততই উহা ধারণ করিতে পারে।) আর তৈল উহার হিতকারী বলিয়া পুণ্য, ও জল উহার শিখার তেজোহ্রাসকারক বলিয়া পাপ। এক্ষণে দেখ, ঐ দীপে জল পড়িলে, যতক্ষণ না জল দূরীভূত হইবে, ততক্ষণ উহা স্থির হইতে পারে না, তদ্রূপ আত্মার পাপমুক্তি না হইলে, আত্মাও স্থির হইতে পারে না। আর প্রদীপে জল পড়িলে, জলের পরিমাণ ও শিখার প্রবলতা অনুসারে, অধিক বা অল্পকাল ও অধিক বা অল্পবেগে শিখার চাঞ্চল্য হয়, তদ্রূপ আত্মার পক্ষেও জানিবে। ইত্যাদি।

পাপ-মুক্তির অন্য উপায়।

কিন্তু যেমন ঐ প্রদীপের জলভাগ উপায়বিশেষ দ্বারা ফেলাইয়া দিলে আর শিখার কোনও চাঞ্চল্য হয় না, তদ্রূপ অন্য কোনও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি পাপগ্রহণ করিলেও পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতএব পাপ হইতে মুক্তির ২য় উপায় ক্ষমতা-পন্ন-কর্ত্তৃক পাপগ্রহণ। এতদ্ভিন্ন স্বর্গীয় বাক্‌সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকদ্বারাও পাপ হইতে মুক্তি হইতে পারে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পুণ্য কাহাকে কহে? পুণ্যের পুরস্কার কি?

৪। যাহাতে অপরের মনে সুখ হয়, সুতরাং সহানুভূতি দ্বারা তোমারও হয়, তাহাই পুণ্য। সাধারণতঃ, কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানকে পুণ্য কহে। যেমন যাহার যেরূপ ক্ষমতা

তদতিরিক্ত কার্য্য করিলে বা আবশ্যক স্থলে তদপেক্ষা অল্প কার্য্য করিলে, পাপস্পর্শ হয়, তদ্রূপ যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে তদনুরূপ কার্য্য করিলে পুণ্য লাভ করিতে পারে।

যেমন পাপ করিলে তাহার ফল তমোময় আত্মগ্লানি অবশ্যই উপস্থিত হইবে, তদ্রূপ পুণ্য করিলে তাহার ফল সত্ত্বময় বা জ্যোতির্ম্ময় আত্মপ্রসাদও অবশ্যই উপলব্ধ হইবে। অতএব পাপের তিরস্কার অবশ্যম্ভাবিনী আত্ম-গ্লানির ন্যায়, পুণ্যের পুরস্কারও অবশ্যম্ভাবী আত্মপ্রসাদ।

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, উপাসনাদ্বারা পাপ হইতে মুক্তি হয় এবং এক্ষণে লিখিত হইল যে, আত্মগ্লানিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যদি কোনও ব্যক্তির উপাসনা-ব্যতীতও আত্মগ্লানি হয়, তবে কি সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে না? ইহার উত্তর এই যে, উপাসনা-ব্যতীত উপযুক্ত আত্মগ্লানি হইতে পারে না। যেমন কলসীতে জল পূরিবার সময়ে, উহা অধিক পূর্ণ হইবার পরে জল পড়িয়া যায়, অথবা জলের বেগে কাইত (কা'ত) হইলেও কতকটা জল পড়িয়া যায়, কিংবা বেগে কলসীর মধ্যে জল পড়িতে আরম্ভ হইলে ছিটা ফোঁটা আকারে কিঞ্চিৎ জল পড়িয়া যায়; কিন্তু কলসী একেবারে উপুড় না হইলে সমস্ত জল কখনই পড়িয়া যায় না। তদ্রূপ উপাসনা-ব্যতীত যে আত্মগ্লানি হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ পাপক্ষয় হইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। দেখ, অনন্ত গুণধামের গুণরাশি স্মরণ না করিলে, স্বীয় হেয়ত্ব উপযুক্তরূপে বোধ হয় না, সুতরাং সমুচিত আত্মগ্লানিও হইতে পারে না। অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, উপাসনা করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথা, উপযুক্ত আত্মগ্লানি না হওয়াতে সম্পূর্ণ পাপ-মুক্তি লাভও হয় না।

জ্যোতি ও অন্ধকারের ন্যায় পাপ ও পুণ্য পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থ হইলেও উহারা একই পদার্থকে অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন দিবার আলোক ও রাত্রির অন্ধকার একই দিবসকে (অহোরাত্রকে) অবলম্বন করিয়া রহে, তদ্রূপ পুণ্য ও পাপও একই পদার্থাবলম্বনে উৎপন্ন হয়। এজন্য তত্ত্বদর্শীরা উহাদিগকে একজাতীয় কহেন।

ওঁং

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই পাঠক জানিতে পারিয়াছেন যে, আত্মাকর্ষণদ্বারা কি কি কার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে। তথাপি নিম্নে এরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিলাম, যাহাতে সূক্ষ্মজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিরাও আত্মাকর্ষণে সম্পাদিত অলৌকিক কার্য্যের বিষয় বিদিত হইতে পারিবেন।

১মতঃ, প্রাচীনকাল ধর, আত্মাকর্ষণদ্বারা মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের বহুবৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। আত্মাকর্ষণ দ্বারা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতিকে তাহাদিগের আত্মীয়গণের নেত্রগোচর করিয়াছিলেন। এ সকল দূরবর্ত্তী কালের কথা। অল্পকাল হইল, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আত্মাকর্ষণদ্বারা যে সকল অদ্ভুতক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এ সকলও দূর দেশের কথা। আত্মাকর্ষক মোনাই ফকিরের আশ্চর্য্য কার্য্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বোধ করি তাদৃশ লোক এখনও ২। ১ জন জীবিত আছেন। অপর, আত্মাকর্ষক মহাত্মা যিশু যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাইবেল-পাঠক মাত্রেই অবগত

আছেন। আত্মাকর্ষক মহাত্মা মহম্মদ যে সকল কার্য্য আত্মাকর্ষণ প্রভাবে করিয়াছিলেন,কোরাণ শরিফে ও অন্যান্য গ্রন্থে তৎসমুদায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। এ সমস্ত যাঁহারা বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ জেলায় গমন করুন, শুনিতে পাইবেন, কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ভীষণ রোগাদি হইতে মুক্তদান-উপলক্ষে আত্মারা কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সমস্ত বিস্তারিতরূপে নির্দ্দেশ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তথাপি কয়েকটী এই যে, কলিকাতার আহারীটোলা পল্লী নিবাসী ত্রিগুণাচরণ মিত্রকে সত্যধর্ম্মাবলম্বী কোনও আত্মাকর্ষক সাধক দেখাইয়াছিলেন যে, মধুমতী নাম্নী নদীতে ভয়ানক তরঙ্গের সময়ে নৌকা এক পার হইতে অপর পারে যাইবার কালে, তাঁহাদিগের নৌকার চতুষ্পার্শে তরঙ্গ ছিলনা। ঐ সাধক কোনও অর্দ্ধাঙ্গ রোগীর রোগ মুহূর্ত্ত মধ্যে আরাম করিয়াছিলেন এবং অপরিচিত বহুব্যক্তিকে উপাসনার ও নিদ্রার সময়ে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন দিয়া রোগ মুক্ত করেন। এই সকল বিষয় ঐ সকল ব্যক্তিদিগের কিংবা ঐ সকল ঘটনাভিজ্ঞদিগের দ্বারাই পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

হে অবিশ্বাসিগণ! যদি ইহাতেও বিশ্বাস না কর, তবে ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ নির্ভর করিয়া অপেক্ষা কর, সত্বরই দেখিতে পাইবে যে, অন্ধ চক্ষু পাইতেছে, পঙ্গু সুস্থ পদ লাভ করিতেছে, বধির শুনিতেছে, বিকলাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ হইতেছে এবং মৃত জীবিত হইতেছে। অধিক কি, সর্ব্বদেশের সমস্ত গ্রন্থে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় ও তদপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা, এক বঙ্গদেশে—পবিত্র বঙ্গভূমিতে এককালে সম্পাদিত হইতেছে !!!

ওঁং

ভূমিকা।

সত্যধর্ম্মের গুণসাধন প্রকরণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। গুণসাধন মানব প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অমুক লোক ভাল, অমুক লোক মন্দ, এ তুলনা কেবল গুণের ন্যূনাধিকতা অনুসারেই হইয়া থাকে। শিষ্ট হও, শান্ত হও, জ্ঞানী হও, জিতেন্দ্রিয় হও, ভক্তিমান হও, প্রেমিক হও, ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ বা এতদ্রূপ প্রার্থনা লোকের শিক্ষা-নিরপেক্ষ ও স্বভাব-নিবদ্ধ। অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া ও সুখে সুখী হওয়া ইত্যাদি গুণসাধনের মূল সূত্রগুলি, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই চিরকাল বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রথমতঃ, গুণসাধন স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ, গুণসাধনই মানব প্রকৃতির উৎকর্ষের মূল যে, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করুক্ না কেন, কিছু না কিছু গুণসাধন নাই, এরূপ ধর্ম্ম জগতে অপ্রসিদ্ধ। কারণ সকল ধর্ম্মেই সত্যধর্ম্মের কণা কণা অংশ বিদ্যমান আছে। সুতরাং যে ধর্ম্ম পূর্ণ, তাহাতে যে পূর্ণভাবে গুণ-সাধনের উপদেশ থাকিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে যে, তৃতীয়তঃ, গুণসাধন সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীয় সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারক গণের অভিমত। চতুর্থতঃ, গুণ দ্বারাই মনুষ্যে ও পশুতে এবং দেবে (পারলৌকিক মহাত্মাতে) ও নরে প্রভেদ। গুণত্যাগ করিয়া বিচার করিতে গেলে ঐ প্রভেদ বিলুপ্ত হয়। যদি পশুভাব পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, যদি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির উচ্ছেদ সম্পাদন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির উন্নতি সাধন করা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বলোকের অভিমত হয়, যদি জ্ঞানলাভ করা সমস্ত মানবমণ্ডলীর অভিপ্রেত হয়, তবে গুণসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বহু লোক যোগ সাধনার পক্ষপাতী লক্ষিত হন। কিন্তু যেমন সূক্ষ্ম রূপে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৫×১৬=২৪০ এইটী গুণ দ্বারা সহজে হয়, কিন্তু যোগদ্বারা হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। আবার, ১৫ পরার্দ্ধ ৭৭ নিখর্ব্ব ৮৯ কোটি ৫৩ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ৪ শত ৬৭ সাতষট্টির ঘনফল স্থির করা যোগ দ্বারা অসাধ্য এবং গুণ দ্বারা সহজসাধ্য, তদ্রূপ যোগ সাধনায় যাহা সহস্র সহস্র বর্ষে হইতে পারে; গুণ সাধনায় তাহা মুহূর্ত্তমাত্রে হইতে পারে (সত্যধর্ম্ম পুস্তক দেখ)। অতএব সাধারণতঃ যেরূপ গণিতের যোগ অপেক্ষা গণিতের গুণদ্বারা অধিক কার্য্য অল্পে হয় বা অসংখ্য অসংখ্য যোগের অসাধ্য কার্য্য গুণদ্বারা অতি সহজে সম্পাদিত হয়. তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতে—ধর্ম্মরাজ্যে যোগসাধনায় যাহা হওয়া কঠিন বা অসম্ভব, গুণ সাধনায় তাহা সহজসাধ্য; সুতরাং যোগ অপেক্ষা গুণই প্রধান।

যদি বল, গুণের মূল যোগ, সুতরাং গুণসাধনা অপেক্ষা যোগসাধনা শ্রেষ্ঠ বলা যায় অথবা গুণসাধনার পূর্ব্বে যোগসাধনা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তর এই যে, যে যোগ গুণের বা গুণসাধনার মূল, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক, তাহা হঠ-যোগাদিসংক্রান্ত বায়ুসাধনা নহে। অন্যকে ভালবাসিতে গেলে যে করুণরসের যোগ আত্মায় থাকা আবশ্যক, যে গুণ-সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্যানুপাত দ্বারা পরস্পরের যোগ থাকা আবশ্যক এবং এতদ্রূপ অন্য অন্য যে সকল সরল গুণ আত্মায় সংযুক্ত থাকা আবশ্যক, সে সকলই আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিয়মে সৃষ্টির সমকালেই প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎসমুদায় পাইবার জন্য অন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না; মানব হৃদয়ে যে স্বাভাবিক গুণাঙ্কুর আছে, তাহাই ঐ গুণসাধনার মূল। হঠ-যোগাদি দ্বারা তাহা কস্মিন্‌কালে প্রাপ্তব্য নহে। বরঞ্চ অনুসন্ধিৎসু

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সমস্ত প্রচলিত যোগ নামে খ্যাত ক্রিয়াগুলি গুণগৌরবের ব্যাঘাতসম্পাদক ও অন্বয়ি সাধনার প্রতিকূল (এসকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রেম ও ভক্তিপ্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে)। অতএব অভিনিবিষ্ট হইয়া ঐ সকল বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলে সকলেরই প্রতীয়মান হইবে যে, গুণসাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক এবং ইহার উপরেই সমস্ত উন্নতি নির্ভর করে।

মানব! তুমি যে মধুময় কাব্য রসে আত্মহারা হইয়া বিমল সুখলাভ কর, তুমি যে সুধাময়ী গীতি শ্রবণ করিয়া শোক দুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক বিমোহিত ভাবে অবস্থিতি কর, তুমি যে একাগ্রতা ও অনুচিকীর্ষার উৎকৃষ্ট ফল স্বরূপ কারুকৃত কার্য্য নিচয়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে অমিশ্র আনন্দ অনুভব কর, তাহাতে কি গুণ সাধনার ফল দেখিতে পাও না? তুমি যে সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের নাম শুনিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ কর, তুমি যে গুণবানের আদর ও দোষীর প্রতি ঘৃণা করিয়া থাক, তাহাতে কি গুণ গৌরব প্রকাশিত বোধ কর না? তুমি যে দোষী ব্যক্তির সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া গুণবানের পবিত্র পর্ণকুটীরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরকাল বিবেচনা করিয়া আসিতেছ, তাহাতে কি গুণ সাধনার কর্ত্তব্যতা প্রকাশিত হইতেছে না??? অতএব আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, গুণই মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, গুণই মানব প্রকৃতির পরিশোধক ও সংস্কারক. গুণই মনুষ্যের উন্নতির মূল এবং গুণই একমাত্র মুক্তির উপায়। ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রকাশক।

উপক্রমণিকা।

যাহা হৃদয়ে ধারণা করা যায়, তাহাকে পদার্থ কহে। (১)

পদার্থ দুই প্রকার, যথা—ভাব ও অভাব।

যাহা স্বয়ং আছে বলিয়া জানা যায়, তাহাকে ভাব-পদার্থ এবং যাহা অন্যের অবিদ্যমানতা প্রকাশক বা অবিদ্যমানতার নামান্তর, তাহাকে অভাব পদার্থ কহে। ঘটী, কৃষ্ণত্ব, গমন ও পশুত্ব ইত্যাদি দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি স্বয়ং আছে বলিয়া জানা যায়, এজন্য ইহারা ভাবপদার্থ এবং অন্ধকার, ছায়া প্রভৃতি আলোকের অবিদ্যমানতাপ্রকাশক বা আলোক বিশেষের অবিদ্যমানতার নামান্তর বলিয়া উহারা অভাব পদার্থ।

ভাবপদার্থ পাঁচ প্রকার; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া), জাতি ও সম্বন্ধ। (২)

পঞ্চভূত, আত্মা এবং এতদুভয়ের যোগে এতদ্দ্বয়-ধর্ম্মী পদার্থকে দ্রব্য কহে।

---

(১) কোন মহাত্মা বলেন যে, যাহা কিংবা যাহার অংশ ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাকে পদার্থ কহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয় সংজ্ঞাই তুল্যার্থবাচক।

(২) প্রকরণাধীন নহে বলিয়া জাতি ও সম্বন্ধের বিষয় মূলে না লিখিয়া টীকায় লিখিত হইল। যাহা নিত্য ও অনেক সমবেত এবং যাহা দ্রব্যাদি ত্রিতয়নিষ্ঠ, তাহাকে জাতি কহে। যথা মনুষ্যত্ব, গোত্ব ইত্যাদি। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতির স্বশ্রেণীর ও পরস্পরের সহিত যে সম্পর্ক, তাহাকে সম্বন্ধ কহে। স্ব-স্বামিত্ব, জন্য-জনকতা, অবয়ব-অবয়বিত্ব, সমবায় প্রভৃতি ভেদে সম্বন্ধ বহু প্রকার।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমনকে কর্ম্ম (ক্রিয়া) কহে। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধজ্বলন এবং তির্য্যগ্‌গমন, গমনের অন্তর্গত।

যাহা দ্রব্যে অবস্থিতি করিয়া দ্রব্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু স্বয়ং দ্রব্য বা ক্রিয়া নহে এবং যাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষিত হয় (অপূর্ণাবস্থায় ও অপূর্ণে), তাহাকে গুণ কহে। গুণের মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী, কিন্তু সকল গুণেরই হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। এতদ্ভিন্ন যে গুণগুলি নশ্বর দ্রব্য অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদিগের লয় হইতে পারে। যাহারা নিত্য দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদেরও কাহারও কাহারও লয় হয়। (৩)

গুণ অনন্ত অর্থাৎ জগতে যে কত গুণ আছে, তাহা নির্ণয় করা মানবীয় শক্তির অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। গুণের বিভাগ করিতে হইলে উহা দুই প্রকারে হইতে পারে; যথা অবলম্ব্য দ্রব্যভেদে এক প্রকার এবং উৎপাদ্য ও নিত্যভেদে অপর এক প্রকার।

---

(৩) কোন মহাত্মা গুণের সংজ্ঞা এইরূপ করেন যথা,—"যে শব্দ উচ্চারণ করিলে কোন না কোন পদার্থের কোন না কোন পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে ঐ ঐ পদার্থের কোন না কোন গুণবাচক শব্দ কহে। ঐ গুণবাচক শব্দ ঐ পদার্থের যাহাকে লক্ষ্য করে, তাহাকে ঐ পদার্থের কোন না কোন গুণ কহে। গুণের আধার পদার্থ ও প্রত্যেক পদার্থের গুণসমষ্টি ঐ পদার্থবোধক। যথা "কাল" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে কোন পদার্থ "কাল" বলিয়া বুঝায়, "কাল" এটী পদার্থের একটী গুণবাচকশব্দ ও পদার্থের যে "কালত্ব" এই শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইতেছে, তাহা ঐ পদার্থের একটী গুণ। এই গুণটি ঐ পদার্থকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। "কালত্ব" ও ইত্যাদি অন্যান্য যে যে গুণ ঐ পদার্থে আছে, তাহাদের সমষ্টি উক্ত পদার্থবোধক।" এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত মহাত্মার লিখিত পদার্থাদি শব্দের সহিত মূল লিখিত পদার্থাদি শব্দের অভিধেয়ের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

অবলম্বা দ্রব্য তিন প্রকার হইলেও গুণ, অবলম্বা দ্রব্যভেদে প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা ভৌতিক গুণ, ও আধ্যাত্মিক গুণ। কারণ তৃতীয় প্রকার দ্রব্য বস্তুতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সংযোগে উৎপন্ন ও উভয়-বিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এজন্য উহাকে অবলম্বন করিয়া যে যে গুণ থাকিতে পারে, তৎসমুদায় আর পৃথক্ বিবেচ্য নহে।

ভৌতিক গুণ—যে সকল গুণ মূলভূত পদার্থ বা ভৌতিক পদার্থনিষ্ঠ, তাহাদিগকে ভৌতিক গুণ কহে। মূলভূত পাঁচটি যথা ব্যোম, বায়ু, অগ্নি (তেজঃ), জল ও মৃত্তিকা। এই পাঁচটীর গুণ যথা-শব্দ; শব্দ ও স্পর্শ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এতদ্ভিন্ন সাধারণ গুণ আকার। ইহাদিগের সবিশেষ বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রকাশিত হইবে।

ভৌতিক পদার্থ অসংখ্য, ইহাদিগের গুণ যথা কৃষ্ণত্ব, শুভ্রত্ব, সুস্বাদ, বিস্বাদ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, বর্ত্তুলত্ব, চতুষ্কোণত্ব ইত্যাদি।

কোন কোন বিজ্ঞানবিদের মতে, আমরা ভৌতিক পদার্থ জানিতে পারি না, কিন্তু উহার কেবল গুণগুলিই জানিতে পারি, এ মত সত্য হউক, বা না হউক, আমরা যে গুণগুলি ত্যাগ করিয়া ভৌতিক পদার্থ জানিতে পারি না, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াও গুণগুলি বুঝা যায় না। অতএব ভৌতিক পদার্থের গুণগুলি উহাকে বিশেষ করে, এজন্য উহাদিগকে বিশেষণ গুণ বলা যায়।

আত্মার গুণকে আধ্যাত্মিক গুণ কহে। ইহাদিগের পরিচয়ের জন্য আধারের অপেক্ষা করে না, এজন্য উহাদিগকে বিশেষ্য গুণ কহে।

ভৌতিক গুণের বিষয় এ প্রবন্ধে বিবেচ্য নহে। আধ্যাত্মিক গুণ-সমূহই এ প্রবন্ধে বর্ণনীয়। যাহাদিগের সাধনাই নিতান্ত আবশ্যক, আত্মার পরমোপকারক, পরিপোষক, অনন্তকালের সহচর এবং প্রেমময়

পরম পিতার সান্নিধ্যলাভে সহায়তাকারক—সেই সকল আধ্যাত্মিক গুণের বর্ণনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক গুণসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—সরল, মিশ্র ও জাতগুণ। যে গুণের অঙ্কুর (৪) আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে, তাহাকে সরল গুণ কহে। যথা প্রেম, সরলতা ইত্যাদি। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে থাকুক, বা না থাকুক, অন্য কোন গুণ বা গুণ-সমূহের যোগে স্বীয় নামে প্রকৃতভাবে পরিচিত হয়, তাহাকে মিশ্রগুণ কহে। যেমন ঈশ্বরভক্তি; ইহা আধ্যাত্মিক প্রেম ও পার্থিব ভক্তির যোগে উৎপন্ন, এজন্য ইহা মিশ্রগুণ। আবার পার্থিব ভক্তি, এটী আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, (ইহার লয় আছে) ইহা কতিপয় আত্ম-নিষ্ঠ গুণা-ঙ্কুরের সম্মিলনে উৎপন্ন। এজন্য ইহাও মিশ্রগুণ।

যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই, ভৌতিক জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত ও তিরোহিত হয়, তাহাকে জাতগুণ কহে। যথা—কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ গুণগুলি উৎকৃষ্ট এবং তৃতীয় শ্রেণীস্থ গুণসমূহ অপকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট গুণগুলির উন্নতি ও অপকৃষ্ট গুণগুলির লয় সাধনাকেই গুণসাধনা কহে। অপকৃষ্ট গুণগুলির অন্য নাম দোষ, সচরাচর গুণ বলিলে উহাদিগকে বুঝায় না। এজন্য গুণসাধনা বলিলে উৎকৃষ্ট গুণ-গুলিরই সাধনা বুঝিতে হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, উৎকৃষ্ট

---

(৪) যে যে স্থানে গুণের অঙ্কুর বলা হইয়াছে, তথায় ব্যক্তিবিশেষের ঐ গুণের অঙ্কুর অপেক্ষা উহা অধিক পরিমাণেও থাকিতে পারে। কেননা যদিও গড়ে সকলেই তুল্যগুণসম্পন্ন, কিন্তু মাতা পিতার অবস্থাবিশেষে কাহারও কোন গুণ অধিক, কাহারও বা অল্প থাকার অবস্থায় জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, কাহার কাহারও ঐ অঙ্কুরের এরূপ বর্দ্ধিত অবস্থাও হইতে পারে যে, উহা ঐ গুণ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত হয়।

গুণের উন্নতি হইলে, অপকৃষ্ট আপনা হইতেই লীন হয়, তাহাদিগের আর বিশেষ সাধনা নাই।

উৎকৃষ্ট গুণগুলির মধ্যে যাহার ব্যাপকতা অধিক, তাহাই প্রধান। প্রেম ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তীর্ণ, এজন্য উহা সর্ব্বপ্রধান। অতএব প্রেম সরল ও সর্ব্বপ্রধান গুণ বলিয়া প্রেমসাধনার বিষয় সর্ব্বপ্রথমে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সত্য-ধর্ম্ম।

গুণ-প্রকরণ।

প্রেম।

১। প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে যত কিছু গুণ আছে, তন্মধ্যে প্রেম সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাংশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ভালবাসা যাহার অঙ্কুর, তাহাকে প্রেম কহে, অথবা ভালবাসার উন্নত পরিণতিকে প্রেম কহে অর্থাৎ অপরকে আত্মায় সংলগ্ন করাকে বা অপরের সুখ দুঃখাদি অবস্থাতে আপনাকে উপনীত করাকে প্রেম কহে। যে গুণ থাকিলে মরিয়াও বাঁচে, আত্মাতে যাহার অভাব কখনও হয় না ও হইতেও পারে না, যাহা দুঃখকেও সুখে পরিণত করে, সুতরাং যাহা সুখদুঃখ চায় না, লাভালাভের অপেক্ষা করে না, কেবল অভীষ্টকে পাইবার জন্য প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকে প্রেম কহে। যে গুণ থাকিলে ঐ গুণের ভাজনকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, আত্মা তৃপ্তিলাভ করে, মনে অভিনব আনন্দরসময় ভাবের উদয় হয়, হৃদয় নবভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ও পরমাত্মার প্রকৃত কার্য্য করা হয়; আর না পাইলে প্রাণ কিছুতেই শীতল হয় না, হৃদয় নীরস হয়, মন ভাবশূন্য প্রায় হইয়া পড়ে, জীবাত্মার ক্লেশের ইয়ত্তা থাকে না, এবং

প্রেম কাহাকে কহে?

পরমাত্মার উৎকর্ষ ও শান্তি হয় না। মূল কথা, যে গুণে ঐ পরম গুণের ভাজনের দোষ গুণে আসিয়া পড়ে, দোষ দেখিতে বাসনা হয় না, কেবল গুণই লক্ষ্য হয়, কথা শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, না শুনিলে জগৎ অন্ধকারময় বোধ হয়, অভাবে জীবন্মৃত থাকিতে হয়, ভাবে সকল অশান্তি দূরে যায়, ফলতঃ ঐ গুণের প্রকৃত ভাজনের চিহ্নমাত্র না পাইলে কিছুতেই জীবিত থাকা যায় না, তাহাকে প্রেম কহে। প্রেমে সকল গুণের গুণত্ব (সংস্কার) হয়, এজন্য উহা গুণের গুরু বলিয়া কথিত হইতে পারে। যেমন কান্তিহীন দেহের কমনীয়তা কাঞ্চনযোগে বাড়ে না, সেইরূপ প্রেমসাধনাহীন আত্মার উন্নতি অন্যগুণে তত হয় না, ইহার সাধনা সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হইলেও সর্ব্বশেষেও শেষ হয় না, সুতরাং ইহা অসীম কাল সাধনের ধন। সর্ব্ব ভূমণ্ডলের সকল লোকের হৃদয়েই প্রেম আছে, (বা প্রেমাঙ্কুর আছে), সকলেই উহার জন্য পাগল, সকলেই ঐ ধনের ভিখারী। ঐ সুধাময় রসের স্বাদ পাইলে মোহিত না হয়, এমন কেহই নাই, তথাপি উহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা বোধ করি কাহারও সাধ্য নহে, কেননা যাহার অন্ত পাওয়া যায় না, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে? দুঃখময় সংসারে সুখের চন্দ্র প্রেম, ভালবাসা জীবনের বন্ধন, জীবন উহাতেই উৎপন্ন, উহাতেই স্থিত এবং উহার ব্যতিক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিষময় বিষয়-ধনে প্রেমসুধা-ব্যতীত কিছুতেই শান্তি নাই। এ ধন আঁধারে আলোক, দুঃখে অশান্তিনাশক ও বর্দ্ধনশীল, সুখে সুখ-বর্দ্ধক, যৌবনে বৃদ্ধত্ব ও বার্দ্ধক্যে তারুণ্য সম্পাদক এবং জীবনের চিরসম্বল। এই অসীম গুণের বর্ণন, অসীম কালেও শেষ হইবার নহে। কোন মহাত্মা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—ভালবাসাকে প্রেম কহে। যে স্পৃষ্ট আত্মার দর্শন আমার নিকট সততই চারু ও মনোহর, যাহাকে নিয়ত দেখিলেও দৃষ্টি তৃপ্তি

বোধ করে না, যাহার কথা চিরমধুময় অমৃতময় ও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্রেই হৃদয় নাচিতে থাকে, বদনে যাহার গুণব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না, হৃদয় যাহাকে হৃদয়স্থ করিয়াও সুখের অন্তিম সীমা লাভ করিতে পারে না, যাহার দোষরাশি কখনই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, অপরের মুখে নিন্দা বা কুৎসা শুনিলে হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হয়, যাহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া যায়, যে পীড়িত হইলে পীড়িত ও প্রফুল্ল হইলে আমোদিত হই, যাহার অদর্শনে সমস্ত শূন্য দেখি, সুখশান্তিবিহীন হই, আমাতে আর আমি থাকি না, কি হই-য়াছে, কিসের অভাব হইয়াছে, অনুভব করিতে পারি না, প্রত্যুত কেবল জীবন্মৃত হইয়া থাকি, যাহার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কামনা হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না, যাহার সামান্য তাচ্ছল্যভাব বা অনাদরে মরমে মরিয়া যাই, যাহাকে নিঃস্বার্থভাবে আমার বলিয়া অঙ্গীকার করি, জীবনসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও যাহার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলে, হৃদয় কৃতার্থ বোধ করে, যাহাকে নিজের অনন্ত দুঃখরাশির কণামাত্র জানাইয়াও দুঃখিত করিতে বাসনা হয় না, আবার যাহার দর্শনে কেমন হইয়া পড়ি, কিছু বলিতে পারি না, কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল পুতুলের মত হইয়া পড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহাকেই আমি ভালবাসি, তাহাকেই আমি প্রেম করি ও এরূপ ভালবাসাকেই প্রেম কহে।

২। প্রেমের অঙ্কুর স্বাভাবিক হইলেও ইহার উৎপত্তি আছে। যেমন বীজ হইতে যে অঙ্কুর জন্মে, তাহাকে বৃক্ষের অঙ্কুর বলা যায়, কিন্তু বৃক্ষ বলা যায় না, তদ্রূপ ঐ অঙ্কুরকে প্রেম বলা যায় না, উহাকে প্রেমের অঙ্কুর বলা যায়।

প্রেমের উৎপত্তি কি?

সৃষ্ট যাবতীয় আত্মাতেই নানাবিধ গুণ আছে এবং পরিমাণে ন্যূন কিংবা অধিক হইলেও প্রত্যেকেরই কতকগুলি গুণ অপরাপরের সহিত

সাধারণ। যেমন প্রেমাঙ্কুর সকলের হৃদয়েই আছে, কিন্তু পরিমাণ পৃথক্; তদ্রূপ অন্যান্য যে যে গুণ আছে, সকলই পৃথক্ পৃথক্ আত্মাতে ভিন্ন পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু এরূপ ভাবে মিলিত যে, প্রত্যেক আত্মারই গুণসমষ্টি অপরের সমান। যে যে আত্মার গুণের পরিমাণ অন্যান্যের অধিক সংখ্যক গুণের পরিমাণের অধিকতর নিকটস্থ অর্থাৎ যাহাদের বহুসংখ্যক গুণের অধিক সামঞ্জস্য আছে, তাহাদের প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কার্য্যের প্রণালী, বাসনা, রীতিনীতি ইত্যাদিও সমান এবং তাহারা সমপথাবলম্বী ও সমব্যবসায়ী, সুতরাং তাহাদের আত্মাই প্রথমে সহজতঃ প্রেমসূত্রে গ্রথিত হয়, হঠাৎ দেখিলেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরস্পর পরস্পরকে প্রেমের পাত্র, ভালবাসার জিনিষ বলিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ও ভালবাসে। যাহার প্রেমাঙ্কুর অধিক তাহার প্রেমের সংঘটন অধিক ও যাহার অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহার ন্যূন হয় এবং যাহার যাহার প্রেমের অঙ্কুর একেবারে কম, তাহারা এই প্রেম বা ভালবাসা অনুভব করিতে না পারিলেও পারে ও সময়ে সময়ে একেবারেই পারে না।

আত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ গুণসামঞ্জস্যকে সাদৃশ্য অনুপাত (Magnetic affinity) কহে। গুণসামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইলে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাত বা সমানুপাত এবং আংশিক হইলে আংশিক সাদৃশ্য অনুপাত কহে।

সম্পূর্ণ বা আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের মিলনে যে ১ম অণুচ্ছেদ-লিখিত অবস্থা জন্মে, অর্থাৎ তাহার সুখদুঃখাদিতে আপনাকে যে উপনীত করা হয়, তাহাকে প্রেমের উৎপত্তি কহে। যেমন কোন কোন বীজ অনুকূল ভূমি, জল, তাপ, আলোক প্রভৃতি লাভ করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া তরুরূপে পরিণত হয়, আর কোন কোন বীজ বহুকাল একভাবে থাকিয়া পরিশেষে অনুকূল ভূমি প্রভৃতি যোগে পূর্ব্ববৎ তরুর আকার ধারণ করে, তদ্রূপ সকল আত্মার পক্ষেই প্রেমোৎপত্তি অনুকূল

ভাজন-লাভসাপেক্ষ। তন্মধ্যে বীজ হইতে জীবের প্রভেদ এই যে, বীজের ঐরূপ পরিণতি পরকীয় সাহায্য-সাপেক্ষ, কিন্তু জীবের ঐরূপ সমুন্নতি অনেক অংশে আত্মপ্রযত্ন-সাপেক্ষ। কেননা জীবের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই পরিচালিত করিয়া সে ঐরূপে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। যদিও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাতীয় না পাওয়া যায়, তথাপি আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের লাভ অসম্ভব নহে, কারণ এই বিশাল ভূমণ্ডলে অসংখ্য নর নারীর মধ্যে তোমার গুণের সহিত কোনও অংশে সাদৃশ্য আছে, এরূপ লোক তুমি অবশ্যই পাইতে পার। আর ঐরূপ লোক লাভ হইলে তোমার সহিত তাহার যে অংশে সাদৃশ্য আছে, তাহার পরিচালনা করিয়া আংশিক প্রেমসুখ লাভ করিলেও করিতেও পার। এইরূপেই আত্মচেষ্টা দ্বারা ভালবাসার যে বৃদ্ধি হয়, তাহাকে প্রেমের উৎপত্তি কহে।

অপিচ, আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের প্রতি ঐরূপ চেষ্টা না করিলে প্রেমাঙ্কুর প্রেমরূপে পরিণত হয় না। মনে কর, তোমার সহিত কোনও

প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাত কি?

ব্যক্তির একটী মাত্র অংশে সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ একটি মাত্র বিষয়ে উভয়ের ঐক্য আছে, অন্য কোনও বিষয়ে নাই। এক্ষণে যদি তুমি ঐ একটি মাত্র বিষয়ে একতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর এবং স্বাধীনতা পরিচালন পূর্ব্বক তাহার সম্বন্ধে অন্য সমস্ত বিষয়ক অনৈক্য ভুলিয়া যাও অথবা হৃদয়ে আসিতে না দেও, তবেই তোমার তাহার প্রতি প্রেম জন্মিবে। নতুবা, অন্ধ জগতে যেমন সচরাচর দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নিয়মে যদি তুমি আপনার মত অভ্রান্ত ভাবিয়া ও তাহার ভ্রান্তি সমূহ (অনৈক্য জন্য) বোধ করিয়া তাহাকে ঘৃণা কর ও তাহার সহিত মিলিতে না চাও, তবে কখনও তাহার প্রতি প্রেম জন্মিবে না। সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাতীয় লাভ হইলেও ঘোরতর স্বার্থপরতা ও অলীক বিষয়াসক্তি প্রবল থাকিলে, ঐ সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনু-

পাতকেও সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং সুধাময়ী স্বাধীনতায় পরিচালিত না হইলে প্রেমাঙ্কুর হইতে প্রেমের উৎপত্তি হয় না এবং এইরূপেই প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাত সংঘটিত হইয়া থাকে। যদিও আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয় স্থলে মমতা দ্বারা প্রেমোৎপত্তি হয়, তথাপি স্বার্থপরতা দ্বারাই যে প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ স্বার্থপরতা বহুবিষয় সংক্রান্ত; তন্মধ্যে মমতা অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত দুঃখ-নিবারণেচ্ছা অথবা অপরকে দুঃখ না দিয়া সুখলাভের ইচ্ছা দ্বারাই প্রেমোৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু অলীক ও ক্ষণবিধ্বংসিনী স্বার্থপরতায় প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাতই জন্মে। পরন্তু কখনও প্রেমোৎপত্তির সাহায্য হয় না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, স্বার্থপরতা দোষ বা জাতগুণ। মমতা সরল গুণ; মমতার ধ্বংস নাই, কিন্তু উহা প্রেমে বিলীন হয়। যাহা হউক, পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, স্বার্থপরতাই প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাত-জননী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩। সম্পূর্ণ বা আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের প্রাপ্তি হইলে যথাক্রমে স্বভাবতঃ বা মমতা ও স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা দ্বারা প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের বা সমান অনুপাতীয়ের লাভ হইলে, আত্মার প্রকৃত স্বভাব অনুসারে প্রেমের উৎপত্তি হয়। প্রেমের প্রকৃত অবস্থা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ইহা আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। ভালবাসার সমুন্নত পরিণতিকে যে প্রেম কহে, ইহা পৃথিবীতে প্রকাশিত নাই, অর্থাৎ ইহা পার্থিব লোকের হৃদয়ে প্রকৃতরূপে অনুভূত হয় না। এজন্যই উহাকে আধ্যাত্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সমানুপাতীয় দুই ব্যক্তির (যেমন স্ত্রী ও পুরুষের) ধর্ম্ম এই যে, তাঁহাদিগের প্রকৃতি একরূপ হইবে, তাহারা একরূপ কার্য্যকে আনন্দদায়ক কিংবা দুঃখপ্রদ বোধ করিবে, একরূপ লোককে

প্রেমের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়?

ভাল বাসিবে এবং একভাবে জীবনযাপন করিতে বাসনা করিবে, সুতরাং তাহাদিগের প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও কার্য্যের একরূপতা প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে এবং এই ভালবাসা কোন কঠোর ব্যাঘাতে ছিন্ন না হইলেই তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম সঞ্চার হইবে। আর, আংশিক সাদৃশ্য-অনুপাতীয়ের স্থলে মমতা দ্বারা প্রথমে প্রেমের আংশিক উৎপত্তি হয়, পরে স্বাধীন ও বিশুদ্ধ ইচ্ছার পরিচালনা দ্বারা স্বার্থপরতা বিনাশিত হইলে সম্পূর্ণরূপে প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপেই প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ২য় অণুচ্ছেদে উহার যে সকল ব্যাঘাতকর বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদায় দূরীভূত না হইলে কেবল প্রেমের ভাজনকে পাইলে প্রেমোৎপত্তি হইতে পারে না।

অপিচ, প্রেমের উৎপত্তি কিরূপে হয়? এই মহান্ প্রশ্নের উত্তরে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে, যেমন কোন দোষ বা অন্য গুণ কিংবা শারীরিক পদার্থ (যথা লোম, নখ বা ব্রণ, দদ্রু প্রভৃতি) উৎপন্ন হইবার সময়ে উহার অনুভব হয় না, কিন্তু স্থিতিকালে উহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তদ্রূপ উৎপত্তিসময়েও প্রেম যে কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বুঝা যায় না বটে, কিন্তু স্থিতিকালে ঐ উৎপত্তির প্রকার কিছু কিছু বুঝা যায়। এ বিষয় সুস্পষ্টরূপে অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, নিজেই ধারণা করিতে পারা যায় না। কেননা, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে একবার দেখিতেই হইবে, অন্ততঃ তাহার কোন চিহ্ন বা বাসস্থান না দেখিলে কোনও মতে হইবে না; কিংবা সে, যে কার্য্য করিতে ভালবাসে, যাহা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করে, যাহা শুনিয়া আনন্দিত হয়, ইত্যাদি, তাহা করিয়া দেখিয়া কিংবা শুনিয়া একবার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে। এইরূপেই ভালবাসা হইতে অজ্ঞাতসারে বা ঈষৎ বিদিতরূপে প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই উৎপত্তিই সুখশান্তিময় স্বর্গরাজ্যের প্রথম সোপান, সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন যে যে উপায়ে প্রেমের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রেমবৃদ্ধির প্রস্তাবে বিস্তারিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, কারণ এখানে নির্দ্দেশ করিলে পৌনরুক্ত্য দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

প্রেম কিরূপে অনুভূত হয়? এবং কি উপায়ে ইহার বৃদ্ধি হয়?

৪। জগতে যত প্রকার উৎপত্তিশীল পদার্থ আছে, সকলের সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়ম দৃষ্ট হয় যে, উহারা সৃষ্টি (উৎপত্তি), স্থিতি ও লয় এই তিনটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে যাহাদিগের স্থিতি দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী তাহাদিগের বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি অবস্থা পরিবর্ত্তনও ঐ স্থিতিকালে লক্ষিত হইয়া থাকে। আর যাহারা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ ক্ষণকাল মাত্র স্থিতি করিয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রায়শঃ অনুভূত হয় না। মনে কর, মানবীয় ও পশ্বাদির দেহ; এই দেহ স্থিতিকালে বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে উৎপাদক পঞ্চভূতে লীন হইয়া যায়; কিন্তু শব্দ, প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিত ও তৃতীয়ক্ষণে লীন হয়। ইহার, স্থিতিকালে বৃদ্ধি লক্ষ্য হয় না, কিন্তু অভিনিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে হ্রস্বতা লক্ষিত হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, অন্ততঃ যাহা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থিতি করে; তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তার অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। প্রেমও ক্ষণমাত্রস্থায়ী নহে, দীর্ঘকালস্থায়ী, (অধিক কি অনন্তকালস্থায়ী বলিলেও কোনও দোষ হয় না) সুতরাং ইহার বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতিও অবশ্যই আছে। এক্ষণে ঐ বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রভৃতি যে কিরূপে হয়, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতির বর্ণনা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে গুণার্থীর মনে অবশ্যই এই প্রশ্নদ্বয়ের উদয় হইতে পারে, যে (১মতঃ) যাহা অনুভূত হয় না, তাহার বর্ণনা শ্রবণের প্রয়োজন কি? কেননা, অননুভবনীয় বিষয়, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের ন্যায়, অনুভব শক্তির উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত

প্রতীয়মান হয়। (২য়তঃ) যদি ইহা অনুভূতই হয়, তবে কিরূপে অনুভব করা যাইতে পারে? অতএব অগ্রে ঐ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাসের বর্ণনা করা যাইবে।

এই বিশাল ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, কোন পদার্থই উৎপত্তির সময়ে অনুভূত হয় না, কেবল স্থিতিকালেই অনুভূত হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, জীবদেহে নখরোমাদির উদ্ভব, ভৌতিক পদার্থের অভেদত্ব নিবন্ধন (আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে সংহতি বা যোগাকর্ষণ দ্বারা) বায়বায় বা বাষ্পীয় পদার্থ হইতে তরল ও তরল পদার্থ হইতে কঠিন পদার্থের জনন এবং দেহান্তরাধান প্রযুক্ত (ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে রাসায়নিক আকর্ষণ বা সম্বন্ধ জন্য) বিভিন্ন জাতীয় দুইটী পদার্থের মিলনে অভিনব গুণসম্পন্ন পদার্থের উৎপত্তি ......ইত্যাদি যে কোন প্রকার উৎপত্তির প্রতিই লক্ষ্য কর না কেন, স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে, উৎপত্তিকালে উৎপৎস্যমান পদার্থের অনুভব কখনও হইতে পারে না। সুতরাং প্রেমও উৎপত্তিশীল বলিয়া উৎপন্ন হইবার কালে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যেমন স্থিতিকালে অঙ্কুরাদি পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ স্থিতিকালে প্রেমেরও অনুভব করা যায়। এই অনুভব অন্য-সাধ্য ; স্ব-সাধ্য নহে (অন্ততঃ মিলন কালে) অর্থাৎ যাহার প্রেমের উৎপত্তি হইয়াছে, সে যে স্থিতিকাল মাত্রেই উহা অনুভব করিতে পারিবে, এরূপ নহে। তবে অন্য প্রেমিক লোকে বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেমোৎপত্তি হইয়াছে, এই মাত্র। প্রেম যখন স্থিতিকালে অত্যন্ত বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব হইয়া যায়, (সে চিন্তাশীল হইলে) তখন উহার বৃদ্ধি ও হ্রাস অনুভব করিতে পারে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ যেন এরূপ মনে করেন না যে, আমি "স্বীয় প্রেমানুভব কখনও হইতে পারে না" বলিয়া

নির্দ্দেশ করিলাম। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সাধারণতঃ এ ধন—এ পরম রতন অনুভব করা কাহারও সাধ্য নাই (অন্ততঃ মিলনকালে)। কারণ, ইহার ধর্ম্ম এই যে, যত পায়, তত চায়; যত ভাব হয়, ততই অভাব বোধ হয় এবং যত হৃদয়ে ধরে, ততই প্রাণে পূরিতে বাসনা হয়। সুতরাং মিলনকালে স্বীয় প্রেমের অনুভব কখনও হইতে পারে না। প্রেমের হ্রাসবৃদ্ধির অনুভব হইলেও হইতে পারে।

পরন্তু যখন বিরহ উপস্থিত হয়,—যখন বিচ্ছেদবিষে হৃদয় জর্জ্জরিত, প্রাণ আকুলিত ও সুখশান্তি বিসর্জ্জিত ইত্যাদি হইতে থাকে, তখন অভাবে ভাব বোধের ন্যায় প্রেমের অনুভব হইতে পারে। তখন কত ভালবাসিত, কত প্রেম করিত, বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং পরিমাণও করিতে সমর্থ হয়।

যে যে উপায়ে প্রেমের বৃদ্ধি হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

১মতঃ—করুণরস দ্বারা প্রেমের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। করুণ রস থাকিলে অপরের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ বোধ হয়। এই গুণটী যাবতীয় চেতন পদার্থেই বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু সকল হৃদয়ে সমান পরিমাণে নাই। সুতরাং প্রেমার্থীর পক্ষে ইহার বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক। করুণরসের বৃদ্ধি করিতে হইলে, প্রথমে অপচিকীর্ষা ও অসূয়াবৃত্তির দমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অপচিকীর্ষা অর্থাৎ অন্যের অপকার করিবার ইচ্ছা। এই বৃত্তি দমন করিতে হইলে অন্যের অপকারে নিবৃত্ত এবং যথাসাধ্য পরোপকারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন "আমি কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যের ফলদান আমার আয়ত্ত নহে, অর্থাৎ আমি অপরের অপকার বা উপকার করিবার চেষ্টা বা চিন্তা করিতে পারি বটে, কিন্তু ঐরূপ করিলেই যে, তাহার অনিষ্ট বা ইষ্ট হইবে, এরূপ নহে; কারণ সে, যেরূপ উপযুক্ত, তদনুসারে পরম ন্যায়বান ঈশ্বর তাহাকে ফলপ্রদান

করিবেন। তবে আমার চেষ্টা ও চিন্তার ফল এইমাত্র হইবে যে, তাহাতে আমি যথাক্রমে পাপস্পৃষ্ট ও পুণ্যপ্রাপ্ত হইব।” ইত্যাদিরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হয়। আর, অসূয়া অর্থাৎ গুণীব্যক্তির গুণে দোষারোপ করা। এইটী নিবারণের উপায় এই যে, প্রথমে কার্য্যে অন্যের দোষারোপ করিতে নিবৃত্ত হইলেই, পরিশেষে ঐ দোষ হৃদয় হইতেও দূরীভূত হইয়া যায়।

এই দুইটী বিপরীত কারণের অর্থাৎ বৃদ্ধির প্রতিকূল হেতুর নিবারণ করা যেরূপ আবশ্যক, আরও কতকগুলি অনুকূল কারণের প্রবর্ত্তনও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। যথা—করুণরসাত্মক গ্রন্থপাঠ, করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার ঘটিলে তথায় উপস্থিত হওয়া, দুঃখার্ত্তকে সান্ত্বনা করা এবং উপচিকীর্ষা অর্থাৎ অন্যের উপকার করিবার ইচ্ছা, ইত্যাদি।

এই করুণরস সহজও বটে, কঠিনও বটে। সহজ এই অংশে যে, ইহা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং কঠিন এই যে, সংসার যেরূপ জটিলতাময়, তাহাতে পদে পদে এই গুণের ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং সবিশেষ সাধনা ব্যতীত এই ব্যাঘাতময় সংসারে ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও বর্দ্ধিত করা বড়ই কঠিন।

২য়তঃ—মমতা। “এই বস্তুটি আমার” এইরূপ জ্ঞানকে মমতার অঙ্কুর কহে। মমতা সরল গুণ, ইহার দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু প্রেমের বর্দ্ধিতাবস্থায় (অভেদ জ্ঞান সময়ে) যাহার সহিত অভেদ জ্ঞান হয়, তাহার সম্বন্ধে উহার সম্পূর্ণ লোপ হইয়া থাকে। তখন “এ আমার” এইরূপ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া, “এ আমি” এইরূপ জ্ঞান হয়। এজন্যই মহাত্মারা কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মমতা দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয় এবং অপর কেহ বলিয়াছেন যে, প্রেমাবস্থায় অভেদ পাত্রের প্রতি মমতা থাকে না।

আমরা যাহাদিগের সহিত নৈসর্গিক নিয়মে মমতায় বদ্ধ (যথা পিতা,

মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি) অগ্রে তাহাদিগের প্রতি সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়। এই নিমিত্তই প্রেমবৃত্তের প্রকৃত কেন্দ্র আপন গৃহ। উহা ঐ স্থান হইতে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া, পরিশেষে সার্ব্বভৌমভাবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে।

৩য়তঃ—তুল্যাবস্থা (National magnetism) বা জাতীয় সাদৃশ্য প্রেমবৃদ্ধির তৃতীয় কারণ। এই জন্যই ধার্ম্মিকের সহিত ধার্ম্মিকের, জ্ঞানীর সহিত জ্ঞানীর, ধনীর সহিত ধনীর, দরিদ্রের সহিত দরিদ্রের এবং বিপন্নের সহিত বিপন্নের সহজেই প্রেম সঞ্চার ও প্রেমবৃদ্ধি হয়। এজন্যই যাহারা এক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, এক কার্য্যে সতত রত থাকে, একরূপ চিন্তা করে ও এক পদার্থের আদর করে, তাহাদিগের মধ্যে যেরূপ প্রেম সঞ্চার ও প্রেমবৃদ্ধি হয়, উহার বিপরীত ভাবাপন্নদিগের মধ্যে তদ্রূপ হয় না। এই নিমিত্তই যাহারা এক ধর্ম্ম অবলম্বন করে বা একবিধ মতে কার্য্য করে, একরূপ নীতিকে অবলম্বনীয় জ্ঞান করে, একরূপ শাসন-প্রণালীর অনুমোদন করে, তাহাদিগের মধ্যে যেরূপ প্রেম বা প্রণয়ের সঞ্চার ও বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, অন্যত্র সেরূপ কখনই হইতে পারে না। ইহার কারণ "তুল্যাবস্থা" সাদৃশ্য-অনুপাতের প্রতিরূপ।

৪র্থতঃ—অন্যের প্রেম। অর্থাৎ অন্যে আমাকে প্রকৃত ভাল বাসে, ইহা জানিলে, তাহার প্রতি প্রেম সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি হয়। আর ঐ প্রেম (অন্যকৃত) যদি কোন মহাত্মার অভেদভাব জনিত হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ের (অন্যকৃত প্রেম বিষয়ের) পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হয়। পরন্তু সময়বিশেষে এই উপায় সম্পূর্ণ কার্য্যকারক হয় না, এজন্যই জগতে এত অধিক পাক্ষিক প্রেম দৃষ্ট হয়।

৫মতঃ ও ৬ষ্ঠতঃ—সদুপদেশ দান ও সৎপথে পরিচালনা। এই উভয় কার্য্য দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধিই হয়, কিন্তু এই দুইটীতে প্রেমোৎপত্তি হয় বলিয়া

প্রতীয়মান হয় না। কারণ, যাহাকে সদুপদেশ দিতে বা সৎপথে পরি-চালিত করিতে যাইবে, তাহার প্রতি প্রেমসঞ্চার না থাকিলে, তুমি কি কখনও ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও? কখনই নহে। অতএব এই দুইটি কেবল প্রেমবৃদ্ধির উপায়।

অপর, উল্লিখিত দুইটি গুণ উভয়নিষ্ঠ হইলেও, উহারা যথাক্রমে দাতা ও পরিচালকের প্রেম এবং গ্রহীতা ও পরিচালিতের ভক্তি বৰ্দ্ধিত করে। এজন্য ঐ গুণদ্বয় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের না হইলে "প্রকৃত প্রেম" জন্মিতে পারে না।

৭মতঃ—"গুণমাত্র দর্শন"। এতদ্দ্বারা প্রেমের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি উভয়ই হয়, অর্থাৎ যাহাকে প্রেম করিতে বা যাহার প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহার দোষভাগ দর্শন না করিয়া, কেবল গুণভাগ দর্শন করিলে, ঐ বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। কারণ দোষের অননুশীলন ও অদর্শন এবং গুণমাত্রের অনুশীলন ও দর্শন নিবন্ধন তাহার প্রতি তোমার যে আন্তরিক আকর্ষণ হইবে, উহাই প্রেমের উৎপাদনে ও উৎপন্ন প্রেমের বৰ্দ্ধনে যথোচিত সাহায্য করিবে।

অপর, যদিও যাহার সমস্ত কাৰ্য্য দেখিতে পারা যায়, তাহার দোষ না দেখিয়া, কেবল গুণদর্শন অতি দুরূহ ব্যাপার, তথাপি নিরন্তর সাধনায় রত থাকিলে ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক, অনেক অংশে কৃতার্থতালাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

৮মতঃ—যদি কোন মহাত্মা তোমাকে ও তোমার প্রেমের পাত্র বা পাত্রীকে অভেদ জ্ঞান করেন; তাহা হইলে, তোমাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম বৃদ্ধি হইবে, এমন কি ইহাতে "প্রকৃত প্রেম" পর্য্যন্তও হইতে পারে। কেননা, প্রকৃত প্রেম ও পারস্পরিক অভেদভাব পরস্পরসাপেক্ষ, উহাদিগের একটী হইলেই যে, অপরটী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ইতঃপূর্ব্বে (৪র্থ অংশে) "অন্যের প্রেম" বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত এই অংশের প্রভেদ এই যে, তথায় "যিনি তোমাকে অভেদজ্ঞান করিলেন" তাঁহার প্রতি তোমার প্রেমসঞ্চার ও প্রেমবৃদ্ধি হইবে, ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে তদ্রূপ নহে। এস্থলে ইহাই উক্ত হইল যে, "তুমি যাহার প্রতি প্রেম করিতে চাও, তাহাকে ও তোমাকেও যদি অপরে অভেদ জ্ঞান করেন, তবে তুমি ও তোমার ঐ প্রেমাস্পদ, পরস্পর অভেদ হইয়া "প্রকৃত প্রেম" পাশে বদ্ধ হইতে পার।"

৯মতঃ—যেমন, পরস্পর প্রেমার্থী দুই জনকে যদি কোন মহাত্মা অভেদ জ্ঞান করেন, তবে তাহাদিগের প্রেমবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐ উভয়ে (দম্পতি বা প্রণয়ার্থিদ্বয়ে) যদি অপর কাহাকেও প্রেম করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাদিগের প্রেম বৃদ্ধি হয়। ঐ অপর ব্যক্তি নিম্নলিখিত-রূপে তিন প্রকার হইতে পারেন। যথা—

(ক) মন্ত্রদাতা গুরু, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি অর্থাৎ উভয়ের ভক্তিভাজন ব্যক্তি, (ইহাদিগের প্রতি উভয়ের ভক্তি)।

(খ) উভয়ে প্রেম করিতে পারে, এরূপ কোন ব্যক্তি (বন্ধু প্রভৃতি)।

(গ) সন্তান অর্থাৎ পুত্র কন্যা প্রভৃতি থাকিলে তাহাদিগের প্রতি স্নেহ।

উল্লিখিত উপায়ে তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রেম (ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ) করিয়া প্রেমবৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

১০মতঃ—যে যে উপায়ে প্রেমের পাত্রী বা পাত্রকে পাই পাই, অথচ পাই না, এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহাতেও প্রেমবৃদ্ধি হয়। কারণ, ইহাতে পাইবার বাসনা ক্রমশঃই পরস্পরের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ঐ বৃদ্ধিই পরস্পরের মধ্যে "প্রকৃত প্রেম" উৎপাদন করিয়া দেয়।

এই বিষয়টী বিবেচনা করিলে, প্রত্যেক দম্পতির অভিভাবকগণের

কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা ঐ দম্পতিকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় (তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে) পাতিত করেন। বিশেষতঃ, এইটি বিবাহের পূর্ব্বে হইলে আরও উত্তম হয়। কিন্তু, সাধারণতঃ তাহা হওয়া বড়ই বিপদ-জনক। কারণ যদি ঐরূপ প্রেমবৃদ্ধি হইবার (প্রকৃত প্রেম জন্মিবার) পরে বিবাহ না হয়, তবে তাহারা অতল পাপসাগরে নিমগ্ন হইয়া চিরশান্তি হারা হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রাচীন হিন্দুরা, বিবাহ দিবার পরে ঐরূপ উপায়ে প্রেমবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন।

সংপ্রতি ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে বিবাহের পূর্ব্বে ঐটি সম্পন্ন করিতে গিয়া, তাহারা যেরূপে ঐ সাধু নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র বিদিত, এ প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, এই সাধু নিয়মকে সাধুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে, পুত্র ও কন্যাকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া, যাহাতে তাহারা পরস্পরের সহিত সময়ে সময়ে মাত্র ক্ষণকালের জন্য দেখা করিতে পারে, অথচ অধিক কাল একত্র থাকিতে না পারে, এরূপ উপায়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে অবলম্বন করা সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি কেহ ইহাতে বাল্যবিবাহের দোষরাশির আশঙ্কা করেন, তবে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি বলিতে হইবে ; কারণ যেরূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাতে বাল্যবিবাহের যাহা দোষ, তাহা হইবার প্রায় সম্ভাবনা নাই। এবং প্রেমবৃদ্ধিরূপ পরম উপকার সাধিত হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে, সুতরাং ইহা দূষণীয় হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় কার্য্য, সন্দেহ নাই।

১১শতঃ। সরলতা—সরলতা শিক্ষা করিলে ও করাইলে, প্রেমার্থী বা প্রণয়ার্থী যুগলের পরস্পর প্রেম বৃদ্ধি হইতে পারে। কারণ পরস্পরের নিকট পরস্পরের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে, কখনই একে অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে দেখ, যখন তুমি জানিতে

পার যে, তোমার স্ত্রী বা কোনও বন্ধু তোমার নিকটে সমস্ত বা অনেক কথা গোপন করেন, তখনই তাঁহার প্রতি তোমার যে প্রেম বৃদ্ধি বা সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার হ্রাস হয়। কপট হৃদয়ে সরল প্রেম স্থান পায় না।

সরলতা দুই প্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ও অভ্যাসকৃত। আদিম দেহধারী-দিগের মধ্যে উক্ত দুই প্রকার সরলতা দৃষ্ট হয়; আর ঐ দেহত্যাগের পরে কেবল স্বভাবসিদ্ধ সরলতাই থাকে। যে সকল মনুষ্য সাংসারিক কার্য্যাদি ভালরূপে বুঝিতে পারে না এবং যাহাদিগের মনে স্বভাবতঃ কোন প্রকার কপটভাব উপস্থিত হয় না, তাহাদিগের স্বাভাবিক সরলতা; আর যাহারা সাংসারিক কার্য্যাদির বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াও অভ্যাস দ্বারা সরলতা লাভ করে, তাহাদিগের অভ্যাসকৃত সরলতা। স্বভাবসিদ্ধ সরলতা, সরলান্তঃকরণের প্রতিরূপ। যে ব্যক্তির সরলতা আছে, তাহার সরলান্তঃকরণও আছে, কিন্তু সরলান্তঃকরণ থাকিলে সরলতা না থাকিতেও পারে। সাংসারিক কুটিলতা, বাক্চাতুরী ও পাক-ফের না বুঝাকে সরলান্তঃ-করণ কহে। কিন্তু যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সহিত যে অকপটভাব (অভেদজ্ঞান), তাহাকে সরলতা কহে। অতএব প্রেমবৃদ্ধি বিষয়ে স্বভাবসিদ্ধ সরলতা বা সরলান্তঃকরণ অপেক্ষা, অভ্যাসকৃত সরলতা সমধিক কার্য্যকারী হয়। একারণ প্রেমের বৃদ্ধি প্রার্থীর পক্ষে সরলতা অভ্যাস নিতান্ত আবশ্যক।

অপিচ, মনে কর, তুমি একটি নলের অভ্যন্তরভাগ, সুধাময় সুধাংশু কিরণে সমুজ্জ্বল করিতে অভিলাষী হইয়াছ। চন্দ্রকিরণ চিরদিন সরলপথ-গামী, সুতরাং যদি ঐ নলটী সরল ও চন্দ্ররশ্মিপাতের অনুকূল ভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই উহার সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ আলোকিত হইবে। আর যদি উহা (ঐ নলটী) বক্র হয়, তাহা হইলে, অনুকূল ভাবে স্থাপিত হইলেও, ঐ নলের যে টুকু সরলতা আছে, ততদূর মাত্র কিরণ প্রবিষ্ট হইবে, কখনই ততোধিক দূরে হইবে না। প্রেমবৃদ্ধি বিষয়ে সরলতা

গুণ যে কি জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা এই উদাহরণে পরিস্ফুট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সুধাময় সমুজ্জ্বল কিরণলাভ, প্রেমবৃদ্ধির রূপক এবং মানব হৃদয়ই উল্লিখিত নলের স্থানীয়। মানব-হৃদয় সরল হইলে, সরল প্রেম তাহাতে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু অসরল (কপট) হইলে, অনুকূলভাজন লাভ হইলেও পূর্ব্ববৎ অধিকতর প্রেম বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

১২শতঃ। একাগ্রতা—একাগ্রতা দ্বারাও প্রেম বৃদ্ধি হয়। যেমন চঞ্চল পদার্থের উপরিভাগে অপর কোনও পদার্থই দৃঢ়ভাবে স্থিত বা ধৃত হয় না, অথবা তাহা ভেদ করিয়া কোনও পদার্থ সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ অস্থির (একাগ্রতা বিহীন) হৃদয়ে (বা হৃদয় দিয়া) প্রেমের দৃঢ়াবস্থান অসম্ভব। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, যখন একাগ্রতার এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, তন্নিবন্ধন দেহের নিস্তব্ধতা ও নিস্তেজ অবস্থার পরে স্পন্দন (কাঁপনি) হইতে থাকে, তখন উক্ত একাগ্রতার সাহায্যে সহজে প্রেম ও শ্রদ্ধা লাভ করা যায়। এবিষয়টী পার্থিব বিজ্ঞানের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দ্বারা প্রকাশ করা সুকঠিন।

১৩শতঃ পবিত্রতা—বা—নিষ্পাপ অবস্থা। ইহা প্রেম বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট সহায়। কারণ যেমন মলিন বসনে রং খোলে না, তদ্রূপ মলিন হৃদয়েও প্রেমের সম্যক্ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১৪শতঃ। সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা। এই গুণেও প্রেমের বৃদ্ধি হয়। কারণ যে দুইটি পদার্থ বিপরীত ভাবাপন্ন ও বহু চেষ্টাসাধ্য, তাহা-দিগের একতরকে লাভ করিতে গেলে, অবশ্যই অন্যতরকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যেমন একটী বস্তু, আমার বাসস্থানের, ১০ মাইল উত্তরে ও অন্যটী ১০ মাইল দক্ষিণে থাকিলে, একটাকে পাইতে হইলে, অপরটী পাইবার স্পৃহা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না তাহা না

হইলে একবার একদিকের কিয়ৎদূর ও পুনরায় অন্য দিকের কিয়ৎদূর গেলে কোনটীই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদ্রূপ ধনস্পৃহা ও প্রেম বৃদ্ধির বাসনা, এই দুইটীর একটী না ছাড়িলে অপরটী কখনই পাওয়া যায় না। অতএব সম্পত্তি-বিষয়ে নিস্পৃহতা দ্বারা প্রেম বৃদ্ধির যথোচিত সাহায্য হয়, সন্দেহ নাই।

১৫শতঃ। "ঈশ্বরদৃষ্টিতে উন্নত ও মানবচক্ষে ঘৃণিত হওয়া" ও এবিষয়ের একটী প্রধান কারণ। যেহেতু, সংসারে যে যেমন পদস্থ, তাহাকে তদ্রূপ আচরণ করিতে হয়, (অথবা তদ্রূপ আচরণ করিয়াই ঐরূপ পদস্থ হইতে হয়)। রাজা যেভাবে চলিবেন, মন্ত্রীকে সেভাবে চলিতে হইবে না, আর মন্ত্রী যেভাবে চলিবেন, সাধারণ প্রজাদিগকে কখনই সেভাবে চলিতে হয় না। আবার, সম্মানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে যেরূপ মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, (মানের জন্য কোন গুরুতর অন্যায় করিতে হইলেও) কার্য্য করিতে হয়, ফলতঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলিতে এবং ঐরূপ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ঘৃণিত ব্যক্তিকে কখনই ঐরূপ পরাধীন ভাবে চলিতে হয় না, প্রত্যুত সে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। এজন্য এইরূপ লোকের প্রেমবৃদ্ধির ব্যাঘাত বড় বেশী ঘটিতে পারে না।

অপিচ, ঐ (মানব-চক্ষে ঘৃণিত) ব্যক্তি, যদি কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার প্রেমবৃদ্ধি হইতে পারে না। কেননা অপবিত্রতা যে প্রেমবৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব "ঈশ্বরদৃষ্টিতে উন্নত ও মানব-চক্ষে ঘৃণিত হওয়া" ও প্রেমবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

১৬শতঃ। বিশ্বাসের অঙ্কুর—বিশ্বাসের অঙ্কুর দ্বারাও প্রেম বৃদ্ধি হয়। যাহার যে যে গুণ আছে, তৎসমুদায় অটলভাবে হৃদয়ে ধারণা করাকে বিশ্বাস কহে। প্রকৃত বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এবিষয়ের আরও দুইটী অবস্থা হইয়া থাকে। যথা—(১) প্রত্যয় বা প্রতীতি, (২) নির্ভরতা

বা ঐ প্রত্যয়ের ধারণা, (৩) কারণজ্ঞানসহকৃত ঐ প্রত্যয়ের সম্যক (অটলভাবে) ধারণা বা বিশ্বাস। এই তিনটী বিভাগের প্রভেদ এই যে, প্রথম অবস্থায় কেবল সাধু ও বিচক্ষণ লোকের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া বিষয়টী প্রত্যয় করিতে হয় অর্থাৎ মানিয়া লইতে হয়। এ অবস্থায় অটলভাবে ধারণা হয় না এবং কারণজ্ঞানও জন্মে না। দ্বিতীয় অবস্থায় ঐ প্রত্যয়ের ধারণা হয় অর্থাৎ উহা যে নিশ্চিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না। কিন্তু কারণজ্ঞানের অভাব থাকে, এবং ঐ অভাবনিবন্ধন ঐ ধারণাও অটলভাবে হয় না। আর তৃতীয় অবস্থায় ঐ বিষয়ের কারণজ্ঞান জন্মে, এজন্য উহা অটলভাবে ধারণা করা হয়।

বিশ্বাসের এই প্রণালী পার্থিব বিষয়েও দৃষ্ট হয়। দেখ, তুমি যখন প্রথমে গুরু মহাশয়ের নিকটে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ (৫ × ৯ = ৪৫) হয় বলিয়া শুনিয়াছিলে, তখন কেবল উহা মানিয়াই লইয়াছিলে; পরে যখন উহা কার্য্যে প্রয়োগ করাতেও কেহ "ভুল হইল" বলিল না, প্রত্যুত বিচক্ষণ লোক মাত্রেই ঠিক হইয়াছে, বলিতে লাগিলেন, তখন তোমার উহা ধারণা হইল এবং সর্ব্বশেষে যখন উহার কারণ (৫কে ৯ বার রাখিয়া যোগ করিলে পঁয়তাল্লিশ হয় ও যোগের সংক্ষিপ্ত উপায়কে গুণন কহে ইত্যাদি) জানিতে পারিলে, তখন ঐ বিষয়টী অটল ভাবে হৃদয়ে ধারণা করা হইল। এইরূপ সর্ব্বত্রই জানিবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে উল্লিখিত তিনটী অবস্থার মধ্যে শেষোক্তটিকে বিশ্বাস কহে এবং দ্বিতীয়টীকে বিশ্বাসের পূর্ব্বাবস্থা ও প্রথমটীকে বিশ্বাসের অঙ্কুর বলা যায়।

এই অঙ্কুর দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়টী, অন্য গুণের সহিত প্রেমের সংযোগে উৎপন্ন হইলেও উহা দ্বারাও প্রেমের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তৃতীয়টী অত্যুন্নত প্রেম বৃদ্ধির ফলমাত্র।

১৭শতঃ। জ্ঞান—জ্ঞান দ্বারাও প্রেমবৃদ্ধির সাহায্য হয়। পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ একজন অদ্বিতীয় প্রেমময় প্রভু আছেন, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি প্রেম করিতেছেন, আমি তাঁহার অংশ, আমাতেও প্রেমাঙ্কুর আছে, উহার বৃদ্ধি করা আমার কর্ত্তব্য ইত্যাদি বোধ হইলে, প্রথমে কর্ত্তব্যতা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে ঐ জ্ঞানের পরিস্ফুটাবস্থায় বাসনা (প্রেম বৃদ্ধির নিমিত্ত) জন্মে অনন্তর, ঐ বাসনা বলবতী হইলে উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তির আধিক্যাবস্থায় অভাব বোধ সহকারে সহজে প্রেমবৃদ্ধি হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন, আমার অমুক বন্ধুর প্রতি পূর্ব্বে যে প্রেম ছিল, এক্ষণে তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইত্যাদি জ্ঞান হইলেও ঐ প্রেম আরও বর্দ্ধিত হয়। অতএব অন্যান্য গুণের ন্যায় জ্ঞানও প্রেমবৃদ্ধির সাধন।

১৮শতঃ ও ১৯শতঃ। কাম ও ক্রোধের দমন—প্রেমের বৃদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে হইবার পরে, দৃষ্ট হয় যে, ঘোরতর কাম (বাসনা) ও ক্রোধ দ্বারা উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে, অতএব কাম ও ক্রোধের দমন দ্বারাও প্রেমবৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই।

২০শতঃ। পাশমুক্তি—পূর্ব্বোক্ত অনুচ্ছেদটী বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রতীয়মান হইবে, যে এ পর্য্যন্ত প্রেমবৃদ্ধি বিষয়ে যতগুলি কারণের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা সমস্ত ও ব্যস্তভাবে প্রেমবৃদ্ধির কারণ হইলেও ঐ গুলিমাত্র দ্বারা অনন্ত কাল প্রেমবৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রেম পরমাত্মাতেই পরিস্ফুট অবস্থায় বিদ্যমান, সুতরাং যে উপায়ে জীবত্ব নাশ হয়, সে উপায়টীই যে, বর্দ্ধিত প্রেমের সুবৃদ্ধি বিষয়ে প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার, পাশমুক্ত হইলেই জীবত্ব নাশ হয়, অতএব পাশমুক্তিই ঐ বিষয়ের প্রধান কারণ। পাশ যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি।

পূর্ব্বে প্রেমবৃদ্ধি বিষয়ে যে যে উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অবলম্বন করিলে, অসমান অনুপাতীয় স্থলেও প্রেমবৃদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ অসমান অনুপাতীয়ও ক্রমশঃ সমানুপাতে পরিণত হয়। সমানুপাতীয় স্থলে সবিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলেও প্রেমবৃদ্ধি হয়, আর অবলম্বন করিলে মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় অধিকতর মনোহর হইয়া উঠে। সুতরাং প্রেমবৃদ্ধি বিষয়ে সমান অনুপাত অর্থাৎ সমানুপাতীয়ের প্রাপ্তিই সর্ব্ব প্রধান কারণ। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকে এ সুখে আপাততঃ বঞ্চিত থাকিলেও অনন্ত মঙ্গলময় পরম পিতার করুণায় কোন না কোন দিন ঐ সুখময়ী উষা প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যতই সূক্ষ্মদেহে প্রাপ্ত হইবেন, প্রেমসাধনা ততই কঠিন হইয়া উঠিবে এবং বিলম্বে হইবে।

যে যে কারণে প্রেমের হ্রাস হয়, তৎসমুদায় নিম্নে লিখিত হইল ;—কিন্তু ঐটী নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যে কোন একটী সাধ্য বিষয় প্রমাণসিদ্ধ হইলেই যে, তাহার বিপরীত সাধ্য বিষয়ও সর্ব্বত্র (বিপরীত ভাবে) প্রমাণসিদ্ধ হইবে, এরূপ নহে। যথা—সমান্তরিক মাত্রেরই সম্মুখীন বাহুদ্বয় পরস্পর সমান এবং যে চতুর্ভুজের সম্মুখীন বাহুদ্বয় পরস্পর সমান তাহা সমান্তরিক। এস্থলে সাধ্য বিষয়ের বিপরীত বিষয়ও সিদ্ধ হইল। পরন্তু সমচতুর্ভুজ মাত্রেই সমান্তরিক বটে; কিন্তু সমান্তরিক মাত্রেই সমচতুর্ভুজ নহে। মনুষ্য মাত্রেই প্রাণী বটে, কিন্তু প্রাণিমাত্রেই মনুষ্য নহে। ইত্যাদি স্থলে সিদ্ধ নহে।

অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে যে কারণে প্রেমের বৃদ্ধি হয়, তৎসমুদায়ের অভাবেই যে প্রেমের হ্রাস হইবে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। তবে কোন কোন স্থানে ঐরূপ হইয়া থাকে মাত্র। সুতরাং এক কথায় প্রেমের হ্রাস বিষয় বলা যাইতে পারে না। উহার কারণগুলিও যথাক্রমে সন্নিবেশিত করা আবশ্যক। কারণ যথা—

প্রেমাস্পদকে অসদুপদেশ দান ও অসৎ পথে পরিচালনা করা ; প্রেম ভাজনের দোষ আলোচনা ; সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ বা প্রেমের বর্দ্ধিতাবস্থার পূর্ব্বে অবিচ্ছেদে একত্র বাস ; কপট ব্যবহার ; চঞ্চলতা অর্থাৎ একাগ্রতার অভাব ও কামনা ; পাপ স্থানে পাপানুষ্ঠান ; বলবতী ধনস্পৃহা ; প্রেমাস্পদের প্রতি অবিশ্বাস, এবং কাম ক্রোধাদি পাশ সমূহের অত্যন্ত বৃদ্ধি।

প্রেমের আধার কি ?

যদিচ হৃদয় দ্বারাও প্রেমানুভব হয়, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, প্রেমের আধার আত্মা। প্রেম আত্মার একটি গুণ, এবং গুণ মাত্রই দ্রব্যনিষ্ঠ, সুতরাং আত্মাই উহার আধার। আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দুই প্রকার। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জীবত্ব ধ্বংস না হইলে প্রেমের যথোচিত বিকাশ ঘটে না, অতএব পরমাত্মাই প্রেমের প্রকৃত আধার।

প্রেমের পাত্র কে ?

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নরনারীই প্রেমের পাত্র। আর ঐ প্রেম অভেদজ্ঞানরূপে পরিণত হইলে, সমস্ত চেতন পদার্থই উহার ভাজন হইয়া উঠে। অতএব সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত চেতন পদার্থ এবং তাহারা যাঁহার প্রেম অঙ্কে বিরাজিত, সেই অনন্ত প্রেমময় অনাদি পুরুষ প্রেমের পাত্র।

প্রেম কত ভাগে বিভক্ত? ও ভাগদিগের বিশেষ বিশেষ বিবরণ কি ?

প্রথমতঃ স্বজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় ভেদে প্রেম দ্বিবিধ যথা—প্রেম ও প্রণয়। অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে বা রমণীতে রমণীতে যে প্রেম তাহাকে প্রণয় কহে, এবং পুরুষ ও রমণীতে উক্ত ভাব হইলে তাহাকে প্রেম কহে। এই দুইটি আবার প্রকৃত ও পাক্ষিক ভেদে দুই প্রকার যথা—প্রকৃত প্রেম ও পাক্ষিক প্রেম, এবং প্রকৃত প্রণয় ও পাক্ষিক প্রণয়।

যদি কোন রমণী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এরূপ প্রেম হয় যে, একে অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, প্রবাসে মলিন ও কৃশ, মরণে জীবন্মৃত, উপদেশে উপদিষ্ট, ও তুল্য ধর্ম্মাবলম্বী হয়, এবং পরস্পর পরস্পরকর্ত্তৃক সৎ পথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহাদিগের ঐ প্রেমকে প্রকৃত প্রেম কহে।

প্রকৃত প্রেম দ্বিবিধ যথা প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক। স্বকীয় সাধনায় বা গুণে যে প্রকৃত প্রেম হয়, তাহাকে প্রাথমিক প্রকৃত প্রেম কহে এবং কোন মহাত্মার বাক্‌সিদ্ধি দ্বারা বা অভেদ জ্ঞান দ্বারা যে প্রকৃত প্রেম হয়, তাহাকে আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেম কহে। এ স্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, সাধনাদ্বারা আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেমও প্রাথমিক প্রকৃত প্রেমে পরিণত হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেম যেমন স্বীয় সাধনা ব্যতীত হয়, তেমন উহাতে সুখও অত্যল্প এবং প্রাথমিক প্রকৃত প্রেম স্বীয় সাধনার দ্বারা হয় বলিয়া উহাতে সুখও অপরিমেয়। অপর প্রাথমিক প্রকৃত প্রেমের ভঙ্গে ঘোরতর পাপ হয়, কিন্তু আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেমের ভঙ্গই হইতে পারে না। এতদ্দ্বারাই গুণার্থী উল্লিখিত উভয় বিধ প্রেমের তারতম্য বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

যদি কোন রমণী-রতন কোন পুরুষের প্রতি প্রেমগুণাসক্ত হন, কিন্তু পুরুষ তাঁহার প্রতি ততদূর বা একেবারেই প্রেমগুণাসক্ত না হন, অথবা যদি কোন পুরুষ-রতন কোন রমণীর প্রতি প্রেমগুণাসক্ত হন, কিন্তু রমণী তাঁহার প্রতি ততদূর বা একেবারেই প্রেমগুণাসক্তা না হন, সেখানে ঐ প্রেমকে পাক্ষিক প্রেম কহে।

প্রণয়ের পক্ষেও ঐরূপ। প্রেম ও প্রণয় একই পদার্থ; কেবল পাত্রের জাতিভেদ অনুসারে গুণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ, উহাতে কোন প্রভেদ নাই।

কোন মহাত্মা বলেন যে, একজাতীয় আত্মাদের মধ্যে যে প্রেম হয়, তাহাকে প্রণয় ও ভিন্ন জাতীয় আত্মাদের ভালবাসা হইলে তাহাকে প্রেম কহে। অর্থাৎ যাহাদিগের ভালবাসা হয়, তাহারা যদি উভয়েই পুরুষ কিংবা উভয়েই রমণী হয়, তবে তাহাকে প্রণয় এবং একটী পুরুষ ও অন্যটী রমণী হইলে তাহাকে প্রেম কহে। প্রেম ও প্রণয় একই পদার্থ, কেবল পাত্রের বিভিন্নতা। উভয়ের ভালবাসা সমান হইলে তাহাকে প্রকৃতপ্রেম বা প্রকৃত প্রণয় কহে এবং একের অন্যাপেক্ষা অধিকতর হইলে কিংবা অন্যে তাহা অনুভব করিতে না পারিলে তাহাকে পাক্ষিক প্রেম বা পাক্ষিক প্রণয় কহে।

প্রেম বা প্রণয়ের উন্নত অবস্থায় অভেদজ্ঞান জন্মে। কারণ ঐ দুইটীই অভেদ জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা ও ঈশ্বরপ্রেমের বর্দ্ধিতাবস্থায় অঙ্কুর। (অভেদ জ্ঞানের বিশেষ বিবরণ অভেদজ্ঞান প্রবন্ধে দেখ, এস্থলে কেবল স্থূল স্থূল বিষয় লিখিত হইল)।

উভয় আত্মাতে কোন বিভিন্নতা নাই, এরূপ অবস্থাকে অভেদ জ্ঞান কহে। উহা অভেদ জ্ঞানের অন্তিম সীমা।

মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, সরলতা, একাগ্রতা, প্রেম, সরলান্তঃকরণ, কাম ও ক্রোধ-বিহীনতা, পাপগ্রহণের ক্ষমতা, ও শ্রদ্ধার অঙ্কুর ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি অপরকে অভেদ জ্ঞান করিতে পারেন।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই অভেদ জ্ঞানের প্রকৃত ভাজন। অভেদ জ্ঞান শ্রদ্ধার পূর্ব্বরূপ।

অভেদজ্ঞান প্রেমানুসারে ৩ প্রকার, যথা—পাক্ষিকপ্রেম হইতে যে অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বর্গীয় অভেদজ্ঞান কহে। প্রাথমিক প্রকৃত প্রেম হইতে যে অভেদজ্ঞান জন্মে, তাহাকে পার্থিব অভেদজ্ঞান কহে। এবং আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেম হইতে যে অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে পারলৌকিক অভেদজ্ঞান কহে।

প্রকৃত প্রেম সূচক যে বন্ধন, তাহাকে (রমণী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রকৃত প্রেম হইয়াছে, তৎপ্রকাশক গ্রন্থিকে) বিবাহ কহে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রেমের পাত্র বা পাত্রীকে চিরসঙ্গিরূপে গ্রহণ করাকে বিবাহ কহে।

যে সকল গুণ দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল গুণের মধ্যে করুণ রস ও মমতা যাহাদিগের আছে, তাহারাই বিবাহের প্রকৃত ভাজন।

দম্পতি প্রেম গুণে পরস্পর আবদ্ধ ও আপাততঃ অন্যের অপ্রাপ্য (প্রকৃত প্রেম বিষয়ে) হইয়া ক্রমশঃ প্রেমের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক পরস্পর অভেদ হইবে এবং ঐ অভেদ জ্ঞানের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের প্রতি প্রেম বিস্তার করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি অনন্ত প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য।

এক্ষণে প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক কতকগুলি বিধি নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) যদি দুই বা তদধিক অবিবাহিতা রমণী কোন এক পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্তা হন, সেখানে যে রমণীর সহিত তাঁহার অধিক প্রেম হইয়াছে, তাহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। অপরা রমণীদিগকে বিবাহ না করায় কোন এক ব্যক্তির অভীষ্ট (প্রকৃত বাঞ্ছা) পূরণ না করিলে যে পাপ হয়, তাঁহার তাহাই হইবে। (যথা একটী গোহত্যা করিলে যে পাপ হয়) যত জনের অভীষ্ট ভঙ্গ করা হইবে, ততটী গোহত্যা করার পাপ হইবে।

(২) যদি অন্য কাহারও সহিত তাঁহার (ঐ পুরুষের) প্রকৃত প্রেম হইয়া থাকে, তবে উহাদিগের কাহাকেও বিবাহ করা উচিত নহে। কেননা বিবাহ না করিলে অভীষ্ট পূরণ না করার পাপ (গোহত্যার পাপ) হইবে, কিন্তু বিবাহ করিলে প্রকৃত প্রেম ভঙ্গের পাপ (মাতৃহত্যার দশগুণ

পাপ) হইবে। পরন্তু কাম ক্রোধাদি বিহীন সাধকেরা উক্ত রমণীদিগের সকলকেই বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের অণুমাত্র পাপ হইবে না, না করিলে পূর্ব্ব পাপ হইবে।

(৩) যদি কোন পুরুষের সহিত দুইটী রমণীর প্রকৃত প্রেম হয়, তবে তিনি কাহাকে বিবাহ করিবেন ? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, সাধক ভিন্ন অপর কাহারও একাধিক রমণীর সহিত প্রকৃত প্রেম হইতে পরে না। আর সাধকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা নাই, তাঁহারা একটীকে বিবাহ করিবেন, কারণ একটী বিবাহ করিলে প্রকৃত প্রেম ভঙ্গের অর্দ্ধেক পাপ ও দুইটী বিবাহ করিলে প্রকৃত প্রেম ভঙ্গের পাপ হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাধকদিগের পক্ষে উভয় বিবাহ করায় কোনও পাপ হইবে না। কারণ, তাঁহারা সাধারণ নিয়মের অতীত।

(৪) যদি কোন রমণীর লৌকিক মতে বিবাহাদি হইয়া পশ্বাচারাদি হইয়া থাকে, পরে যদি অন্য কোন পুরুষের সহিত তাহার প্রকৃত প্রেম হয়, তাহা হইলে পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন না।

(৫) যদি কোন রমণীর কোন পুরুষের সহিত পশ্বাচারাদি হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রেম না হয়, এবং তদনন্তর যদি ঐ পুরুষ লোকান্তরে গমন করেন, আর অপর পুরুষের সহিত উক্ত রমণীর প্রকৃত প্রেম হয়, তাহা হইলে উক্ত রমণী ও পুরুষের বিবাহ হইতেপারে, কিন্তু পশ্বাচারাদি হইতে পারে না।

(৬) যদি কোন বিধবা স্ত্রীর অপর পুরুষের সহিত প্রকৃত প্রেম হয়, আর তাহার পূর্ব্ব পতির সহিত প্রকৃত প্রেম বা পশ্বাচারাদি না হইয়া থাকে, তবে অপর পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ ও পশ্বাচারাদি হইতে পারে।

(৭)সহোদর ও সহোদরা প্রভৃতি এক রক্তজ বা নিকট সম্পর্কীয় (মাতৃ ও পিতৃকুলজ) দিগের পরস্পর বিবাহ হইলে, সন্তানের শরীরের কিঞ্চিৎ

দুর্ব্বলতা প্রভৃতি হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রেম হইলে উহাদিগেরও বিবাহ দেওয়া উচিত।

৯। যদিও অপরকে হৃদয়ে ধরিবার ও অপরের হৃদয়ে ধৃত হইবার নিমিত্ত একমাত্র প্রেম ব্যতীত আর গুণ নাই, তথাপি উহা প্রথমাবস্থায় চারি প্রকারে থাকে সুতরাং চারিটী নামে অভিহিত হয়, যথা—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

ভক্তির ভাজন,—মাতা ও পিতা এবং বিবিধ গুণসম্পন্ন ও আপন অপেক্ষা উন্নত আত্মা।

প্রেমের ভাজন,— প্রথমে স্ত্রী ও বন্ধু, পশ্চাৎ নিখিল নর নারী।

স্নেহের ভাজন,—কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি।

শ্রদ্ধার ভাজন—জগতের অন্যান্য যাবতীয় চেতন পদার্থ (জীব জন্তু বৃক্ষ লতা পর্ব্বত প্রভৃতি)। প্রেমের সমুন্নত পরিণতির ফলই শ্রদ্ধা। বিশেষতঃ প্রেমের উন্নতি করিতে পারিলেই অর্থাৎ স্নেহ ও ভক্তিকে প্রেমরূপে পরিণত করিতে পারিলে, শ্রদ্ধা সবিশেষ প্রেমভূষণে বিভূষিতা হইয়া অতুল আনন্দ বিধান করে। এজন্য এস্থলে ঐ দুইটী বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল।

১মতঃ—স্নেহকে প্রেমে পরিণত করিতে হইলে, স্নেহাস্পদদিগকে অভেদ জ্ঞান করিলেই এই মনোরথ সিদ্ধ হয়।

২য়তঃ—ভক্তিকে প্রেমে পরিণত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপায় সমূহ বা উহাদিগের অন্যতম উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

(ক) ভক্তিভাজনের সমস্ত স্নেহাস্পদদিগকে অভেদ জ্ঞান করা।

(খ) ভক্তিভাজন যাহাদিগকে অভেদ জ্ঞান করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে অভেদ জ্ঞান করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে অভেদ জ্ঞান

করা। কিংবা যাহারা ভক্তিভাজনকে অভেদ জ্ঞান করিয়াছে, তাহাদিগকে অভেদ জ্ঞান করা।

(গ) যাহারা ভক্তিভাজনের সমানুপাতীয়, অথচ যাহারা ভক্তি-ভাজনকে ও ভক্তিভাজন যাহাদিগকে অভেদ জ্ঞান করেন নাই, তাহাদিগকে অভেদ জ্ঞান করা। কারণ ঐ সকল সমানুপাতীয় ব্যক্তির সহিত ভক্তিভাজনের অভেদ জ্ঞান হইলেই, ভক্তিভাজন ও সহজে অভেদ হইয়া প্রেমের ভাজন হইবেন।

(ঘ) পিতাকে অভেদ জ্ঞান করিবার আর এক উপায়। বিমাতাকে বা গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্য যে রমণীর সহিত পিতার প্রাগনিক প্রকৃত প্রেম হইয়াছে, তাহাকে অভেদ জ্ঞান করা। এইরূপে পিতার প্রতি অভেদ-জ্ঞান হইলেই মাতার প্রতিও ঐ অভেদ ভাব করা সহজ হইবে।

(ঙ) জন্মান্তরে ঐ সকল সহজে হয়।

(চ) জীবত্বধ্বংস বা জীবত্বধ্বংস হইবার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে এইগুলি হওয়া সুকঠিন।

১০। প্রেমের অঙ্কুর আত্মার স্বভাবসিদ্ধ আভরণ। অর্থাৎ সকল সময়েই আত্মাতে থাকে। ইহার ক্ষয় নাই, ক্রমশঃ উন্নতি বা সাম্যাবস্থা এই উভয়ের একটি নিশ্চিতই হইবে। এই উন্নতি সাধনাকেই প্রেমের সাধনা কহে।

প্রেমের সাধনা কিরূপে হয়?

প্রেমের সাধনা করিতে হইলে, প্রথমে সমানুপাতীয় ভিন্ন জাতীয় (স্ত্রীর পক্ষে পুরুষ ও পুরুষের পক্ষে স্ত্রী) ভাজন লাভ করা আবশ্যক। কারণ সমানুপাতীয় স্থলে সহজে প্রেমসাধনা হইতে পারে, কিন্তু অসমান অনুপাতীয় স্থলে ঐ সাধনা অত্যন্ত দুরূহ। পূর্ব্বোক্ত সমানুপাতীয় আত্মা-দিগের কিছুকাল এক স্থানে ও কিছুকাল দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান এবং গুণানুশীলন দ্বারা প্রেমাঙ্কুরের বৃদ্ধি হয়, এইরূপে উক্ত আত্মাদিগের

প্রেমসাধনা হইয়া থাকে। আর বিভিন্ন অনুপাতীয় স্থলে, পূর্ব্বে যে সকল প্রেমবৃদ্ধির উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় অবলম্বন এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রেমের ব্যাঘাতকর বিষয়সমূহের পরিবর্জ্জন দ্বারা ক্রমশঃ প্রেম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপেই উহাদিগের প্রেমসাধনা হয়।

প্রেমসাধনা বিষয়ে কোন মহাত্মার মত এই—প্রেম নিত্য ও সরল গুণ, সুতরাং আত্মার সহজ ধর্ম্ম, সকল আত্মাতে কিছু না কিছু প্রেম আছে, বা প্রেমের অঙ্কুর আছে। "মমতা" তাহার প্রকাশক। প্রত্যেকেই অন্য কাহাকে না কাহাকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার অঙ্কুরকে অসীমগুণে, অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধন করা অর্থাৎ সৃষ্ট অসংখ্য পদার্থকে একেবারে ভালবাসিতে অভ্যাস করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই অপরিমেয় প্রেমময়ের সহিত প্রেম করাই প্রেমসাধনা। প্রেমসাধনা অতি কঠোর ব্রত, অনন্ত এবং সকল সাধনার প্রসূতি।

সাধনার ফল কি? ঐ ফলের উপলব্ধি কিরূপে হয়?

১১। প্রেমের ব্যাপকতা লাভই প্রেমসাধনার ফল। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-রূপে একজনের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি করিয়া, তাহাকে অভেদজ্ঞান করিতে হয় এবং তাহার প্রতি যে অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেও তৃপ্তিলাভ না করিয়া আরও প্রেমবৃদ্ধি করিতে হয়। ফলতঃ, একজনের প্রতি অভেদ-জ্ঞানে অতৃপ্তি হইলে, উহার প্রতি প্রেমের চরম সীমা উপস্থিত হয়। অনন্তর, ঐ অভেদজ্ঞান ও অতৃপ্তিনিবন্ধন, ঐ ব্যক্তির আত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বহু আত্মার সমানুপাতীয় হয়। তৎপরে তাহাদিগকেও ঐরূপ করিতে হয়। এইরূপে নিখিল চেতন পদার্থ সমানুপাতীয় হইলে ও তাহাদিগকে অভেদভাবে গ্রহণ করিলে, তাহারা যাঁহার অংশ, তাঁহার সহিতও সাদৃশ্যানুপাত হয় ও তাঁহাকেও প্রেম করা যায়। এই প্রেমসুধা লাভই প্রেমসাধনার অন্তিম ফল। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে,

সৃষ্টির অনন্ততাপ্রযুক্ত ঈশ্বরের প্রতি অভেদজ্ঞান (১) কথনই হইতে পারে না।

যাহার প্রতি প্রেম অন্তিম সীমায় উপস্থিত হয়, নিরন্তর তাহার গুণানুশীলন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার যে দোষ আছে, ইহাতে প্রত্যয় হয় না, সতত তাহাকে হৃদয়ের আভরণ করিয়া রাখিতে বাসনা হয়, এবং অভেদ জ্ঞানের যে সকল লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় দৃষ্ট হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি হইলেই ঐ সাধনার ফলের উপলব্ধি হইতে পারে।

এবিষয়ে কোন মহাত্মা বলেন যে, "গুণসামঞ্জস্যসম্পন্ন আত্মাদিগের একত্র বাস ও সাময়িক বিরহ, একত্র আলাপ ব্যবহার, গুণানুশীলন ও একত্র কার্য্যাদি দ্বারা প্রেমাঙ্কুরের পরিবর্দ্ধন সাধন হয়। যাহার প্রেম অধিক পরিমাণ, তাহার অধিক বৃদ্ধি ও যাহার প্রেম ন্যূন, তাহার অল্প হয়। প্রেম বৃদ্ধির সূচনা হইলে, উভয় আত্মাই উভয়কে উপাসনা করে, কিংবা যে অধিক প্রেম করে, সে অপরকে আভরণ করে। এক মত, এক পথ, এক বাক্য, এক জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি হইয়া পড়ে। উপাস্যের চিন্তা, ধ্যান ও আলাপ কোন সময়েই যেন হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় না, তখনই তাহাদের কিংবা উহাদের একটীর প্রেমবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপে যথন এক আত্মার অন্যের সহিত প্রেমের সূচনা, সংঘটন ও পরিবর্দ্ধন সাধন হইতে লাগিল, তখনও বহুসংখ্যক আত্মার সহিতও উহাদের প্রেমের কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু যতগুলিকে একেবারে প্রেম করিতে থাকিবে, তাহাদের মধ্যে একটীকে অভেদজ্ঞান

(১) অন্তর্গত হইয়া অভেদজ্ঞান, অন্তর্গত করিয়া অভেদজ্ঞান এবং সমভাবে অভেদজ্ঞান এই তিনটীর মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি ২য় ও ৩য় হয় না, কিন্তু ১মটীর জন্য সাধকগণ কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন।

না করিলে অর্থাৎ উভয় আত্মাতে কোনও বিভিন্নতা নাই এরূপ ভাবে পরিণত করিতে না পারিলে অন্যান্য আত্মাদের সহিত প্রেমসাধন সুচারুরূপে হয় না ও অসম্পূর্ণ থাকে এবং চরম সীমা পায় না। কেননা প্রেম হৃদয়ের একই ভাব, তাহা এক সময়ে এক ভিন্ন তদপেক্ষা বহুসংখ্যক আত্মাতে সমভাবে ন্যস্ত হইতে পারে না, সুতরাং একটী একটী করিয়া অভেদ করিতে হয়। প্রেমের চরম সীমা অভেদজ্ঞান ও প্রেমে অতৃপ্তি। অভেদ করিয়াও তৃপ্তিবোধ না করাকে অতৃপ্তি কহে। এইরূপে যখন ২।৩।৪।৫ ইত্যাদি সংখ্যক আত্মাকে ভালবাসিতে লাগিল, প্রেম করিতে লাগিল, তাহার একটী একটী করিয়া চরম সীমায় উপস্থিত হইতে থাকিল, তখন প্রেম ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অসীম অনন্ত প্রেম-ময়ের দিকে অগ্রসর হইতে চলিল। বিশ্বজগতের সমুদায় সৃষ্ট পদার্থকে অভেদ করিয়া, তাহাদের সৃজনকর্ত্তার প্রতি প্রেম অসীমগুণে সাধিত হইতে থাকিল। সুতরাং ইহার সাধনাও অনন্ত।"—

প্রেমের শক্তি কি? কার্য্য কি? লক্ষ্য কি?

১২। প্রেমের শক্তি অনন্ত; অনন্তকাল বর্ণন করিলেও ইহার শেষ করা যায় না। প্রেম পশুকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যকে দেবত্বে ও দেবতাকে অনাদি পুরুষের প্রেমে বিমোহিত করিয়া আদ্যত্বে উপস্থিত করে। প্রেমপ্রভাবে সমস্ত দোষ সহজ সাধনায় অনায়াসে দূরীভূত হয়। প্রেমের গুণে অন্য সমস্ত গুণ স্বল্প সাধনেই উপলব্ধ হয়। প্রেম সমস্ত গুণের রাজা, সকল গুণের গুরু এবং নিখিল গুণরাশির প্রসূতি ও পরিপালক। যাহার প্রেম আছে, তাহার সকলই আছে। যে এই ধনের ভিখারী সেই-ই প্রকৃত ভিক্ষুক; যে এই অনন্ত সাধ্য সাধনে তৎপর নহে, সে সাধনাহীন, তাহার কোন সাধনাই কার্য্যকরী নহে। যেমন সূর্য্য হইতে সমস্ত মণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে ও সূর্য্য কিরণ ব্যতীত তাহাদিগের উন্নতি ও অবস্থান অসম্ভব, তদ্রূপ প্রেম হইতে

সমস্ত গুণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রেমসাধনা ব্যতীত তাহাদিগের স্থিতি ও ও উন্নতিও একান্ত অসম্ভব, সন্দেহ নাই।

প্রেম মৃতকে জীবিত করে ও জীবিতকে, অপরকে জীবিত করিবার শক্তি দেয়, ইহার শক্তি অনন্তকাল বর্ণনা করিলেও শেষ হইবার নহে, এজন্য এবিষয়ে নিবৃত্ত হইলাম।

দ্রব্যের ন্যায় গুণেরও কার্য্য আছে। প্রেম একটী গুণ, সুতরাং ইহারও কার্য্য আছে। প্রেমের শক্তির বিষয়ে যাহা উক্ত হইল, তাহাতেই ইহার কার্য্যেরও উল্লেখ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র নির্দ্দেশ করিতেছি যে, অংশকে ক্রমশঃ পূর্ণত্ব প্রদান করাই প্রেমের কার্য্য।

প্রেমাঙ্কুর আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ উহা স্বভাবতঃ আত্মায় বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ঐ অঙ্কুরের লয় কখনও হইতে পারে না। কিন্তু উৎপন্ন প্রেমের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতে পারে। আর যখন উহা এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, উহার ঐ হ্রাস অবস্থা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, বা উহার বৃদ্ধি আর সহজে করা যায় না, তখনই হার ক্ষীণভাব উপস্থিত হয়। এই ক্ষীণভাব এরূপ যখন হয় যে, আর. উহা অনুভবনীয় রূপে প্রতীয়মান হয় না, তখনই লোকে ভাবে যে প্রেমের লয় হইয়াছে। কিন্তু উহার সম্পূর্ণ লয় কদাপি হইতে পারে না।

প্রেমের লয় না হউক, কিন্তু উহার ভঙ্গ হইতে পারে। প্রেম একটি গুণ, ইহা জড় পদার্থের ন্যায় দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধবিশিষ্ট নহে, সুতরাং ইহার ভঙ্গ কিরূপে হয়?—ভঙ্গ শব্দের অর্থ দ্বিধা বিভাগ অর্থাৎ দুইটীর একত্র কার্য্য করিবার অভাব। যখন প্রেমগুণাসক্ত দুইটী আত্মা প্রেম গুণে এক হইয়া বা এক হইবার উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট হইয়াও ঐরূপ অবস্থা-পন্ন হয়, তখনই তাহাদিগের প্রেমভঙ্গ হইয়াছে, বলা যায়। সাধারণতঃ

ব্যভিচার ও অন্যতরের পরিত্যাগ প্রভৃতি কারণে প্রেম ভঙ্গ হয়। প্রেম ভঙ্গ অর্থাৎ প্রেমাস্পদের ঐরূপ অভাব হইলে আত্মার ঘোর কষ্ট উপস্থিত হয় ও উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই সুকঠিন হইয়া পড়ে। আর ঐটী প্রকৃত প্রেম হইবার পরে হইলে অর্থাৎ প্রকৃত প্রেম ভঙ্গ হইলে, আত্মার অশেষ ক্লেশ হয়, আত্মপ্রসাদ বিলুপ্ত হয়, যাতনার সীমা থাকে না। প্রকৃত প্রেমভঙ্গ হইলে হৃদয়ে যে দুঃসহ ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহা ইহলোক ও পরলোকে থাকে এবং পারলৌক উন্নতির পক্ষেও অনেক বাধা প্রদান করে। এ ক্লেশের শান্তি সাধারণতঃ ইহলোকে হয় না, পরলোকেও বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ ক্লেশ যায় না। সংসারে যত কিছু পাপ আছে, প্রকৃত প্রেম ভঙ্গ হইতে অধিক কিছু নহে। ঐ পাপ মাতৃহত্যার দশগুণ বা তদপেক্ষাও অধিক। ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

উপায় যথা—(১) যদি পুত্র থাকে, তৎপ্রতি স্নেহ।

(২) পার্থিব লোকের (যাহাদের আত্মীয় তাহাদিগের) প্রতি ক্রম অনুসারে ভক্তি, প্রেম ও স্নেহ।

ইহা করিলে ও নিজের ঐ পাপ হইতে মুক্তি বাঞ্ছা করিলে প্রকৃত-প্রেম ভঙ্গ পাপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। মূলকথা, ঐ পাপ হইতে মুক্তি পাইতে গেলে বিমল জ্যোতি (আত্মপ্রসাদ) আবশ্যক; কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভ করাও তৎকালে সুকঠিন। এই নিমিত্তই এই পাপ এত ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে।

ওঁ প্রেমময় ওঁ।

সত্য-ধর্ম্ম।

গুণ প্রকরণ।

ভক্তি।

মঙ্গলময়ের মঙ্গলরাজ্যে যাবতীয় মিশ্র গুণের মধ্যে ভক্তি অতি উৎকৃষ্ট গুণ। প্রেমের হীনতাকে বা প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাবকে ভক্তি কহে (১) ভক্তি কাহাকে কহে? যে গুণ দ্বারা উপকারী বা আপন অপেক্ষা উন্নত মহাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে মন আকৃষ্ট হয়, যে গুণ দ্বারা সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ইত্যাদি ভাব সকল "ইনি আমা অপেক্ষা উন্নত" এই জ্ঞান সহকারে সীমাবদ্ধ ভাবে উপস্থিত হয়, যে গুণে ঐ গুণের ভাজনের দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি করা জীবনের মহাব্রত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ফলতঃ যে গুণ দ্বারা প্রেম প্রবন্ধে প্রেমের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত অল্পতর ভাবে উপস্থিত হয়, তাহাকে ভক্তি কহে। অথবা নিজের স্বার্থের জন্য নির্ভরতা বা নির্ভরতার অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হইয়া অন্যের প্রতি যে আসক্তি বা অনুরাগ উৎপাদন করে তাহাকে ভক্তি কহে। মূলকথা ভয়ে ভয়ে ভালবাসাকে ভক্তি কহে।

---

(১) ভক্তি কাহাকে কহে, এ বিষয়ে কতিপয় প্রাচীন পণ্ডিতের মত এই—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপাচ। যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধোভবতি, অমৃতী ভবতি, তৃপ্তো-ভবতি। যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী

ভক্তির পূর্ণতা হইলেই উহা প্রেমে পরিণত হয়। যেমন নদীর অন্তিম সীমা পাইলেই সাগর লাভ হয়, যেমন সীমাবদ্ধ কালের অন্তে

ভবতি, যজ্ জ্ঞাত্বামত্তো ভবতি, স্তব্ধোভবতি, আত্মারামো ভবতি। ইতি নারদ কৃত ভক্তি সূত্রং। অর্থাৎ যাহা লাভ করিয়া পুরুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতীভূত হয়, ও তৃপ্ত হয় এবং যাহা পাইয়া কিছুই বাঞ্ছা করে না, শোক করে না, দ্বেষ করে না, রত হয় না ও উৎসাহী হয় না, সেই কাহার (কোন কোন মতে ঈশ্বরের) উদ্দেশে পরম প্রেম স্বরূপা অমৃত স্বরূপাকে ভক্তি কহে। এইরূপ লিখিয়া গ্রন্থকার সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় ৩য় অনুরাগকে লিখিযাছেন।

'তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ। ১৫।" অর্থাৎ তাহার (ভক্তির) লক্ষণ সকল, অন্যে যাহা বলিযাছেন, তাহা এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কেননা এ বিষযে নানা মতভেদ আছে। "পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ। ১৬।" পূজাদিতে অনুরাগকে ভক্তি কহে, ইহা পরাশরাত্মজ ব্যাস কহিয়াছেন। "কথাদিষ্বিতি গার্গ্যঃ। ১৭। গার্গ্য বলেন যে, কথাদিতে অনুরাগকে ভক্তি কহে। "আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ। ১৮।" শাণ্ডিল্য বলেন যে, পূর্ণ পরমাত্মায় যে রতি, তাহার অবিরোধে অনুরাগকে বা অবিরোধী বিষয়ে অনুরাগকে ভক্তি কহে। কিন্তু এই ঋষি (শাণ্ডিল্য) স্বকৃত ভক্তিসূত্র নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 'সা পরানুরক্তি রীশ্বরে" (শাণ্ডিল্য কৃত ভক্তিসূত্রে প্রথমাহ্নিকে দ্বিতীয় সূত্রং)। অর্থাৎ ঈশ্বরে অত্যন্ত অনুরাগকে ভক্তি কহে। যাহা হউক, এক্ষণে নারদ আর কি বলেন দেখা যাউক। "নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতেতি। ১৯।" অর্থাৎ নারদ বলেন যে, সমস্ত (স্বকৃত কর্ম্মাদি) ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে এবং ঈশ্বরের বিস্মৃতিতে অত্যন্ত ব্যাকুলতাকে ভক্তি কহে। অতএব প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতের মর্ম্ম এই যে, অনুরাগকে ভক্তি কহে। এই অনুরাগ কাহারও মতে কথাদিতে, কাহারও মতে পূজাদিতে ও কাহারও মতে আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে হইলেই তাহাকে ভক্তি বলা যায়। পূর্ব্বে ভক্তির লক্ষণ, যাহা যাহা প্রাচীনগণ লিখিত বলিয়া উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয় নাই। কারণ উহার কোন কোনটী ভক্তির অঙ্গ মাত্র, পূর্ণ ভাব নহে এবং কোন কোনটী প্রেমের অঙ্কুরের বর্ণনা মাত্র, প্রকৃত ভক্তির বর্ণনা নহে।

প্রেম ও ভক্তির প্রভেদ?

উপস্থিত হইলেই অনন্ত কালে পতিত হইতে হয় এবং যেমন ইহলোক ত্যাগ করিলেই পরলোকে যাইতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির অন্তিমভাগে উপনীত হইলে একমাত্র প্রেম ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞানগোচর হয় না। যেমন সমুদ্রতীর প্রবাহিত নদী ও সমুদ্র এই উভয়ের মধ্যভাগস্থ ব্যক্তি নদী ও সমুদ্র উভয়ই এককালে লাভ করিতে পারেন, তদ্রূপ ভক্তি ও প্রেম একবারেই সাধিত হইতে পারে, কারণ পাত্র ভিন্ন হইলে উল্লিখিত

ভারতীয় পূর্ব্বতন কতিপয় পণ্ডিত ভক্তি ও প্রেমকে এক পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ও স্থূল দর্শনে উভয়েই এক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্রের ও কার্য্যের বিভিন্নতা প্রযুক্ত উহারা এক নহে। উহাদিগের প্রভেদ মূলে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মত এই—যথা নারদকৃত ভক্তি সূত্রে দশম অনুবাকে—

"ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী।" গুণ মাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি-দাসাসক্তি-সখ্যা-সক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তি-তন্ময়তাসক্তি পরম বিরহাসক্তিরূপৈকধাপ্যেকাদশধা ভবতি। ৮১। ৮২॥" অর্থাৎ ভূত, ভবৎ ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে বিদ্যমান ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই প্রধান, তাহাই প্রধান,। ভক্তি এক প্রকার হইয়াও একাদশ প্রকার, যথা—গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাসাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি, এবং পরম বিরহাসক্তি,। উল্লিখিত সূত্রদ্বয় পাঠে জানা যায় যে গ্রন্থকার ভক্তি, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ প্রভৃতিকে এক ভক্তির অন্তর্গত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৮৩তম সূত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে বিদিত হওয়া যায় যে, গ্রন্থকার এবিষয়ে কেবল নিজ মত প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিতেরও ঐ প্রকার মত—"ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক, শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য শেষোদ্ধবারুণিবলিহনুমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ॥ ৮৩॥" অর্থাৎ যাহারা মানবগণের পরিহাসকে ভয় করেন না, সেই সকল কুমার (অশ্বিনীকুমার বা সনকাদি), ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি ভক্ত্যাচার্য্যগণ একমতাবলম্বী হইয়া এইরূপ বলেন।

গুণদ্বয়ের সাধনা এককালে হইবার বাধা নাই। পরন্তু এক পাত্রে পার্থিব ভক্তি ও প্রেমের সাধনা হইতে পারে না বটে, কিন্তু ঈশ্বরভক্তি ও প্রেম সাধনা হইতে পারে।

প্রেম অসীম গুণ, ভক্তি ঐ গুণের সীমাবদ্ধ ভাব অর্থাৎ সভয় প্রেম। সৃষ্ট আত্মা অসীম, সুতরাং প্রেমের ভাজনও অসীম, কিন্তু ভক্তির ভাজন অসীম নহে। কেননা সকলকেই ভয় করি না বা সমীহ করি না। বিশেষতঃ, যত উন্নতি হইতে থাকিবে, ততই ভক্তিভাজনের সংখ্যা অল্পতর হইবে, এবং অবশেষে একমাত্র অনাদি পুরুষই ভক্তিভাজন থাকিবেন। কেননা প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ভক্তিভাজন থাকেন, প্রেম দ্বারা তাঁহাদিগকেও প্রেমভাজন করিতে হয়। এ বিষয় প্রেমপ্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন প্রেমভাজনের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ প্রভৃতি হয়, যেমন প্রেমভাজনের গুণানুবাদ শ্রবণকীর্ত্তন ইত্যাদি আত্মার সহজধর্ম্ম, তদ্রূপ ভক্তিভাজনেরও হয়। যদুক্তং মহাত্মনা—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।" কিন্তু ভক্তির ভাজন অসীম নহে এবং ভক্তির (পার্থিব) লয় আছে, এজন্য উহাকে (ভক্তিকে) প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাব বলা যাইতে পারে।

প্রেমে "আমি ইহার, এ আমার" এইরূপ জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয়, কিন্তু ভক্তিতে তদ্রূপ হয় না। ভক্তি হইলে পরিবর্ত্তিতভাবে ঐ জ্ঞানের একাংশ মাত্র হয়, অর্থাৎ "আমি ইহাঁর" এইরূপ জ্ঞান মাত্র হয়। পরে ভাষার শক্তি ও বিচার দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে শেষ অংশের জ্ঞানের (ইনি আমার এই বোধের) আভাসমাত্র আইসে।

প্রেম হইলে প্রথমে "ইনি আমার" এই জ্ঞান হয় এবং পরিণামে অভেদ জ্ঞান হইলে, "ইনি আমি" এইরূপ হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তি যতকাল থাকে, তাহার মধ্যে উহার একটীও বোধ হয় না (ভক্তিভাজনের প্রতি)।

যদিও প্রেমের প্রথমাবস্থায় প্রেমভাজনকে আপন অপেক্ষা উন্নত ভাবিলেও ভাবিতে পারে, কিন্তু পরিণামে "উন্নত বা অবনত" এইরূপ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া "উভয়ে তুল্য ও উভয়ে এক" এই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তিতে তদ্রূপ নহে। ভক্তিভাজনকে চিরকাল (যতদিন তাঁহাকে প্রেমভাজন না করা যাইবে) আপন অপেক্ষা উন্নত বোধ করিতে হয়। যদিও পিতা বা মাতা আপন অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট বা নিম্নশ্রেণীস্থ হন, তথাপি যতদিন তাঁহাদিগের প্রতি প্রেম করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি তাঁহাদিগকে উন্নততর স্থানে স্থাপন করিতে বাধ্য। সুতরাং ভক্তিভাজন মাত্রকেই আপনাপেক্ষা উন্নত ভাবিতে হইবে।

প্রেমের ঋণ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ভক্তির ঋণ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়।

প্রেম দ্বারাই ঋণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় এবং প্রেম দ্বারাই ঋণমুক্তি হয়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা কেবল ঋণ বৃদ্ধিই হয়।

প্রেমের ঋণ অপরিশোধ্য ও অসীম, কিন্তু ভক্তির ঋণ পরিশোধ্য ও পরিমেয়।

যেমন কোন ব্যক্তির নিকটে ঋণ থাকিলে, তাহার ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত দ্রব্য না রাখিয়া সমস্ত দ্রব্য অপরসাৎ করিতে ন্যায়ানুসারে অধিকার থাকে না তদ্রূপ প্রেমাস্পদকে আপনার সহিত না মিলাইয়া বা অভেদ জ্ঞান না করিয়া অপরকে আত্মদান করা যাইতে পারে না। কিন্তু ভক্তি ভাজনের পক্ষে তদ্রূপ নহে অর্থাৎ উহঁাকে ঐ রূপ মিলাইবার বা অভেদ জ্ঞান করিবার পূর্ব্বেই ঐ রূপ হইতে পারে।

ভক্তিগুণ আত্মার স্বাভাবিক নহে। অর্থাৎ প্রথমে আত্মাতে ভক্তি

নামক কোন গুণ বা গুণাঙ্কুর থাকে না। কারণ, আত্মা যে পূর্ণ পরমাত্মার অংশ, তাঁহাতে যাহা নাই, তাহা তদীয় অংশে কিরূপে প্রথমাবস্থায় থাকিবে? সুতরাং ভক্তির উৎপত্তি আছে।

ভক্তির উৎপত্তি আছে কিনা?

পূর্ণ পরমাত্মার যে যে গুণ নাই, সৃষ্ট আত্মায় বা অপূর্ণ আত্মায় তদতিরিক্ত যে যে সীমাবদ্ধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায় অংশের পূর্ণনিষ্ঠ গুণধারণায় অক্ষমতা ও জড়জগতের সহিত সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন গন্ধক ও পারদের অণু সকল অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী করিয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, ও সেখানে মলিনতা জন্মে, কিন্তু তাপ সংযোগ করিলে উহা লোহিত বর্ণ হয়, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সীমাবদ্ধ গুণসমূহের যোগেও অপকৃষ্ট ও মিশ্র গুণের উৎপত্তি হইতে পারে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, যদি ঐ উৎকৃষ্ট গুণগুলি অসীম হয়, তবে কখনও অপকৃষ্টের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। মনে কর, একজনের দয়াবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী, কিন্তু ন্যায়পরতা তাদৃশী নহে। এস্থলে সে অনায়াসে দয়ার বশীভূত হইয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব জগতে নাই। কিন্তু যে অনন্ত মহাত্মার দয়াও অনন্ত, ন্যায়পরতাও অনন্ত, তাঁহা হইতে অনন্ত মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। সুতরাং অমঙ্গল-সাধনী বৃত্তির সন্নিবেশ, তাঁহাতে কখনই হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এবিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রকাশিত হইবে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তিগুণ নাই বলিয়া অপূর্ণ আত্মার ভক্তি নামক গুণ যে থাকিতে পারে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

গর্ভস্থিত আত্মার কথা দূরে থাকুক, অতি শৈশবাবস্থায়ও ভক্তির উৎপত্তি হয় না। দেখ শিশুরা মাতার মস্তকাদিতে পদসংযোগ করিয়াও

ভক্তির উৎপত্তি কিরূপে হয়?

অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা স্ব স্ব জননীর প্রতি যে, কোনও উন্নত ভাব রাখিতে হইবে, ইহা বিবেচনা করে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, তৎকালেও তাহাদিগের হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার হয় না। অনন্তর ভেদ জ্ঞানের সঞ্চার-সহকারে যখন ঐ স্বাভাবিক মমতা (এটী আমার জ্ঞান) কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হয়, যখন মনে কৃতজ্ঞতা,উপচিকীর্ষা প্রভৃতির উদয় হইতে থাকে, এবং যখন জননীর প্রতি "তুমি আমার" বলিয়া যে স্বাভাবিক মমতা ছিল, তাহা "আমি তোমা হইতে উৎপন্ন ও তুমি আমার গর্ভধারিণী" বলিয়া কিঞ্চিৎ অন্যবিধ ভাব সমন্বিত ও পৃথগ্‌ভাবে পরিণত হয় অর্থাৎ "আমি তোমার" এইভাবে পরিণত হয়, তখনই ভক্তির উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপেই পার্থিব ভক্তির উৎপত্তি নিম্ননির্দ্দিষ্ট গুণসমূহের যোগে উৎপন্ন হয়। যথা—

কি কি গুণের যোগে পার্থিব ভক্তি হয়?

(১) করুণ রস,
(২) উৎপন্নের আদিত্ব বোধে উৎপাদকের প্রতি মমতা ও কৃতজ্ঞতা।
(৩) নির্ভরতা
(৪) উপচিকীর্ষা
(৫) ন্যায়পরতা
(৬) গুণাদরেচ্ছা
(৭) আধ্যাত্মিক প্রেমাঙ্কুর

(১) করুণ রস—এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রেম প্রবন্ধে দেখ।

(২) মমতার বিবরণও প্রেমপ্রবন্ধে দেখ। প্রেমের বিষয়ে যে মমতা, ইহাও তাহাই, কেবল পার্থিব পক্ষে বিভিন্ন। যে কৃতজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে, উহা এইরূপ—উৎপন্ন সন্তান উৎপাদক মাতা পিতাকে আপনার আদি বোধ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে।

(৩) নির্ভরতা অর্থাৎ ইনি আমাকে রক্ষা না করিলে আমি মুহূর্ত্তও বাঁচিব না, এই স্বার্থ জন্য নির্ভরতা।

(৪) উপচিকীর্ষা—উপকার করিবার ইচ্ছা। এই উপচিকীর্ষা কৃতজ্ঞতা-

সহযোগে চালিত হইলেই উপকারীর উপকার না করিয়া থাকিতে পারে না।

(৫) ন্যায়পরতা—সতত ন্যায়পথে ভ্রমণ করাকে ন্যায়পরতা কহে। যে ন্যায়পরতা সরল গুণ, ইহ তাহা নহে। এ বিষয়ের বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রকাশিত হইবে।

(৬) গুণাদরেচ্ছা—কোনও ব্যক্তির কোনওগুণ দেখিলে তাঁহার আদর, অভ্যর্থনা করা যে আমাদিগের সহজ জ্ঞানসাধ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৭) আধ্যাত্মিক প্রেমের অঙ্কুর—পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের সহিত এই অঙ্কুরের যোগে ভক্তি জন্মে।

ভক্তির বিভাগ ও লক্ষণাদি।

ভক্তি দুই প্রকার; যথা—পার্থিব ভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি। মাতা, পিতা, গুরুদেব বা গুরুদেবী এবং অন্যান্য মহাত্মাদিগের প্রতি যে ভক্তি, অর্থাৎ অপূর্ণ আত্মার প্রতি যে ভক্তি, তাহাকে পার্থিব ভক্তি কহে। আর পূর্ণপুরুষের প্রতি যে ভক্তি, তাহাকে ঈশ্বরভক্তি কহে। ভক্তিভাজন ভেদে ভক্তি উল্লিখিত দুই প্রকার বটে, কিন্তু ভক্ত অনুসারে উহা (ভক্তি) অষ্টাদশ প্রকার। পরন্তু এস্থলে উহাদিগের বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

পার্থিব ভক্তির উৎপত্তি বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে

ঈশ্বরভক্তির উৎপত্তি।

ঈশ্বরভক্তির উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঈশ্বরভক্তি নিম্নলিখিত দুইটি গুণের সংযোগে উৎপন্ন; যথা—

(১) পার্থিব ভক্তি

(২) আধ্যাত্মিক প্রেম

পার্থিব ভক্তি মাতা, পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের প্রতি করা হয়, সুতরাং উহা সীমাবদ্ধ। ঈশ্বরভক্তি অসীম সীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্রেম অনন্ত বলিয়া ঈশ্বরভক্তি অনন্তের সীমাবদ্ধ আকার। মনে কর, "ক" নামক একটি বস্তু পার্শ্বে (চতুষ্পার্শ্বে), অধোদেশে ও উর্দ্ধদেশে অসীম, এবং "খ"

নামক একটি বস্তু পার্শ্বে ও অধোদেশে সীমাবদ্ধ হইয়াও ঊর্দ্ধদেশে অসীম। এস্থলে যেমন "ক" ও "খ" এ প্রভেদ, ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বর ভক্তিতে তদ্রূপ প্রভেদ। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাবকে ভক্তি কহে।

ভক্তি কিরূপ গুণ?

পার্থিব ভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি উভয়ই মিশ্রগুণ। কারণ ভক্তি নামে কোন গুণ বা গুণাঙ্কুর আত্মায় স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে না, এবং পরে কতিপয় গুণসংযোগে উৎপন্ন হয়।

ভক্তি কিরূপে অনুভূত হয়?

ভক্তি কিরূপে অনুভূত হয়, এবিষয়ে প্রেম প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, ভক্তি বিষয়েও তাহা তাহাই জ্ঞাতব্য। মূল-কথা, উৎপৎস্যমান পদার্থের উৎপত্তিকালে অনুভব হয় না বলিয়া ভক্তিরও উৎপত্তিকালে অনুভব হয় না। কিন্তু উৎপন্ন হইলে অন্যভক্ত অনায়াসেই উহা অনুভব করিতে পারেন এবং যখন ভক্তিভাজনের গুণ-স্মরণে গদ্গদভাষণ ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ প্রভৃতি লক্ষণ হয়, তখন স্বয়ংও অনুভব করা যায়।

ভক্তির আধার কি?

ভক্তি পূর্ণে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কারণ যিনি পূর্ণ, তাঁহার সকলই পূর্ণ, সুতরাং তাঁহাতে সীমাবদ্ধতা কিংবা আত্মা-পেক্ষা উন্নত বলিয়া জ্ঞান থাকা অসম্ভব। এজন্য অপূর্ণ আত্মাই ভক্তির আধার।

ভক্তির ভাজন কে?

যে পরমারাধ্যা জননী আমাদিগকে ৯ মাস ১০ দিন (অধিকাংশ আত্মার দেহ ইহা অপেক্ষা অল্প দিন গর্ভে থাকে।) গর্ভে ধারণ করিয়া অশেষ ক্লেশরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি আমাদিগের জন্য মলমূত্রাদি পদার্থেও ঘৃণাশূন্য হইয়া—ক্লেশরাশিকে ক্লেশ বোধ না করিয়া অতি যত্নে—প্রাণপণে আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, সাধনা নিরপেক্ষ হইয়াও যিনি আমাদিগের সুখে সুখিনী ও দুঃখে

দুঃখিনী ; যিনি আমাদিগের রোগে রুগ্নের ন্যায় ও আরোগ্যে রোগমুক্তের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে দুঃখ ও সুখ অনুভব করিয়াছেন, আমরা যাঁহার শরীর-নিঃসৃত স্তন্য সুধাপানে জীবনের প্রথমাবস্থা—ঘোরতর বিপৎসঙ্কুল আদ্যাবস্থা অতিবাহিত করিয়াছি, আমরা দূরে থাকিলে যাঁহার মন আমাদিগের অভিমুখে অবস্থিতি করে এবং নিকটে থাকিলে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অভিপ্রবিষ্ট হয়, বিদেশ বাসকালে আমাদিগের কুশলবার্ত্তা শুনিলে যাঁহার নেত্রে, আনন্দসাগরের উদ্বেলতার পরিচায়ক সুশীতল আনন্দাশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে ও অমঙ্গল শ্রবণ করিলে যাঁহার নয়নে, মনস্তাপাধিক্যে বিদীর্ণ হৃদয়ের চিহ্নস্বরূপ অত্যুষ্ণ শোকাশ্রু প্রবাহ প্রবাহিত হয় এবং আমাদিগের প্রশংসাবাদ অপরের মুখে আকর্ণন করিলে, যাঁহার হৃদয়ে সুবিমল আনন্দ উপস্থিত হইয়া মুখের অপূর্ব্ব প্রফুল্লভাব উপনীত করে। ফলতঃ, সন্তানের শুভোদ্দেশে যিনি দুঃখকে সুখ ও মৃত্যুকে জীবন বলিয়া বোধ করেন, সেই পরমারাধ্যা স্নেহময়ী বাৎসল্যময়ী জননীই সংসার মধ্যে পরম ভক্তিভাজন। পিতা তাঁহার গুরু (৩), সুতরাং ভক্তিভাজন। এতদ্ভিন্ন, যিনি আমাদিগের ভরণপোষণের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্তিবোধ করেন নাই, প্রত্যুত শরীর-শোণিত নিরন্তর জলীয় আকারে পরিণত হইয়া ঘর্ম্মাকারে নির্গত হইতেছে

(৩) পরমার্থ বিষয় সমস্তই গুহ্য। ঐ গুহ্য বা গুপ্ত বিষয়ের উপদেষ্টাকে গুরু কহে। গুরুর আরও অনেক লক্ষণ আছে, তৎসমুদায় "গুরু-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে দেখ। ভক্তিভাজন মাত্রেই গুরুজন, কিন্তু গুরুজন মাত্রেই ভক্তিভাজন নহেন। কারণ যদি তুমি কোন গুরুজনকে প্রেম করিতে সমর্থ হও, তবে তিনি তোমার গুরুজনই রহিলেন বটে, কিন্তু আর ভক্তিভাজন নহেন। যেমন দীক্ষাদাতা গুরুকে যে প্রেম করে, ঐ দীক্ষাদাতা তাহার গুরুজন বটেন, কিন্তু ভক্তিভাজন নহেন। (পার্থিব ভক্তির লয়ের বিষয়, এই গ্রন্থের শেষভাগে এবং ভক্তিকে প্রেমে পরিণত করিবার বিষয় প্রেম-প্রবন্ধে দেখ।)

দেখিয়াও যিনি অমাদিগের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন নাই, যিনি আমাদিগের জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হইয়া অশেষ যত্ন করিয়াছেন এবং আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ ও প্রশংসালাভ করিলে যাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, যিনি পার্থিব ভক্তির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পাত্রী আমাদিগের গর্ভধারিণীর সহিত মিলিত হইয়া পরম পিতার অনন্ত ক্ষুদ্রাংশেও একটী তদীয় প্রতিরূপ প্রকাশিত করেন, ফলতঃ যাঁহার প্রতি ভক্তি সাধনা করিয়া আমরা সুদুর্লভ ঈশ্বরভক্তিলাভে চরিতার্থ হই, সেই সংসার মধ্যে পূজ্যতম—সেব্যতম জনক আমাদিগের ভক্তিভাজন।

অপর, যিনি সৎপথ—প্রকৃত পথ—ঈশ্বররাজ্যে গমন করিবার পথ প্রদর্শন করেন. যিনি জ্ঞানের বিমল আলোক প্রদান পূর্ব্বক মানস-তিমির বিদূরিত করিয়া অপূর্ব্ব রমণীয় জ্যোতিতে হৃদয়দেশ শোভিত করেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, যিনি বিপৎকালে যেখানে থাকুন না কেন, উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় প্রদর্শন করেন বা স্বয়ং মুক্ত করিয়া দেন এবং যাঁহার সুপবিত্র মুখোচ্চারিত পবিত্রতম মহামন্ত্র লাভ করিয়া ইহজীবনের—অনন্তজীবনের দুঃখদাবদাহ দূরীভূত ও মানব জন্ম সফল হয়, সেই পরমপূজ্য—পরমারাধ্য মহাত্মা গুরুদেব ভক্তি-ভাজন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা আপনাপেক্ষা উন্নত এবং ঈশ্বরের উপাসনায় ও গুণসাধনায় সতত রত, যাঁহাদিগের মনোবৃত্তিসমূহ সতেজ; যাঁহারা কাম-ক্রোধাদি পাশমুক্ত এবং যাঁহাদিগের প্রেম, সরলতা ও বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান আছে, সেই সকল মহাত্মারাও ভক্তিভাজন।

পূর্ব্বে যে ভক্তির কথা লিখিত হইল, উহা পার্থিবভক্তি, সুতরাং উল্লিখিত মাতা, পিতা, গুরুজন প্রভৃতি পার্থিব ভক্তির ভাজন।

পরন্তু, যিনি অনাদি ও অনন্ত, যিনি অনন্ত-উন্নত-অনন্তগুণের অনন্ত-রূপে অনন্ত নিধান, যিনি পূর্ণ ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন ও

সর্ব্বসুখশান্তিবিধাতা, পার্থিব ভক্তির বিদ্যমানতায় বা লয়েও যাঁহার প্রতি অনন্তরূপে অনন্তকাল অনন্তজগতের অনন্তভক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই অনন্ত মঙ্গলময় পরম পিতাই একমাত্র অনন্তকালের ভক্তিভাজন।

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিভাজনগণের প্রতি ভক্তি করা আমাদিগের প্রকৃতির অনুকূল হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও কাহারও ভক্তি-উৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। যে যে কারণে ঐ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

ভক্তির উৎপত্তির ব্যাঘাত কি ?

(১) যে স্বার্থপরতা সমস্ত দোষের মধ্যে প্রধান, অর্থাৎ যাহার অপেক্ষা অধিক বা যাহার তুল্য দোষ (ক) জ্ঞানচক্ষুর গোচর হয় না এবং যাহা সমস্ত গুণের সাধনারই ব্যাঘাত-কারিণী, তাহা যে ভক্তির উৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

(২) নিরন্তর ভক্তিভাজনের দোষানুশীলন—যাঁহার প্রতি ভক্তি করিতে হইবে, প্রথমাবধি যদি তাঁহার কেবল দোষই চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না।

(৩) যে যে গুণে ভক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সেই গুণের উৎপত্তি বা বৃদ্ধির ব্যাঘাতে ভক্তির উৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে।

(ক) দোষ ও পাপ এক নহে। দোষ কারণ, পাপ কার্য্য, দোষ চালিত হইয়া যাহা করা যায়, তাহার অধিকাংশই পাপ এবং পাপ করিবার জন্য যাহাতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই দোষ। পাপের মধ্যে যেমন প্রকৃত প্রেমভঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, তেমনই দোষের মধ্যে স্বার্থপরতা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। কারণ যদিও স্বার্থপরতা আত্মাকে স্পর্শ করে না, ও করিতেও পারে না, যদিও হৃদয়েই ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, তথাপি ইহার ধ্বংস না হইলে আত্মার প্রকৃতরূপে উন্নতি হয় না এবং কি প্রেম, কি ভক্তি, কি সরলতা কোন গুণেরই যথোচিত বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

(৪) এতদ্ভিন্ন যে যে হেতু বশতঃ ভক্তির হ্রাস হয় (পরে দেখ) তৎসমুদায়ও প্রথমাবধি অবলম্বিত হইলে ভক্তির উৎপত্তিবিষয়ে ব্যাঘাত জন্মে।

ভক্তি একটী গুণ, সুতরাং ইহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে পারে। কি কি কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে, (খ) তৎসমুদায় নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল।

পার্থিব ভক্তির বৃদ্ধি, প্রেম সাধনা ও উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরভক্তি বর্দ্ধিত হয়। যেমন প্রকৃতপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমের অঙ্কুর, তদ্রূপ পার্থিব ভক্তিও ঈশ্বরভক্তির অঙ্কুর। পার্থিব ভক্তি ব্যতীত কখনই ঈশ্বরভক্তি জন্মিতে পারে না। পার্থিবভক্তি বৃদ্ধি ও প্রেমসাধনা এই উভয়ের মধ্যে প্রেম সাধনার বিষয় ইতঃপূর্ব্বে প্রেম প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে পার্থিব ভক্তি বৃদ্ধির উপায় নিম্নে লিখিত হইল।—

কি কি উপায়ে ভক্তির বৃদ্ধি হয়?

(খ) কি উপায়ে ভক্তি লাভ করা যায়, এবিষয়ে নারদকৃত ভক্তিসূত্রে এইরূপ আছে। যথা—"তস্যাস্ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ, তত্তদ্‌বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ. অব্যাবৃত ভজনাৎ। লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্ত্তনাৎ। মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব, ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।" "তস্যা জ্ঞানমেব সাধন মিত্যেকে। অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে। স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারাঃ। রাজগৃহ ভোজনাদিষু দৃষ্টত্বাৎ। ন তেন রাজপরিতোষঃ। ক্ষুধাশান্তির্বা। তস্মাৎ সৈবগ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ।"

অর্থাৎ আচার্য্যেরা ভক্তির সাধন (লাভের উপায়) এইরূপ বলিয়াছেন যে, সেই সেই বিষয় (যৎসমুদায়ে ভক্তির ব্যাঘাত হয়) ত্যাগ করিলে, সঙ্গ পরিহার করিলে, নিরন্তর ভজনা করিলে, লোকের নিকটেও ভগবানের গুণশ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, প্রধানতঃ. মহতের কৃপালাভ হইলে বা ভগবানের কৃপালেশ পাইলে, ভক্তিলাভ হয়। কতকগুলি লোকে জ্ঞানকেই ভক্তির সাধন বলেন, অন্যেরা ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পরের আশ্রয় বলেন, এবং ব্রহ্মকুমার অর্থাৎ সনকাদি বলেন যে, ভক্তি স্বয়ংই ফলস্বরূপ। যেমন রাজগৃহ ও ভোজনাদির জ্ঞান হইলেই রাজপরিতোষ বা ক্ষুধাশান্তি হয় না, তদ্রূপ জ্ঞান থাকিলেই ভক্তিলাভ হয় না। অতএব মুমুক্ষুগণের ভক্তি গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

(১) করুণ রস, (২) মমতা, (৩) ভক্তিভাজনে প্রত্যয়,

(৪) ভক্তিভাজনের গুণানুশীলন,

(৫) ভক্তিভাজনের নিকটে উপদেশ গ্রহণ,

(৬) ভক্তিভাজন কর্ত্তৃক সৎপথে পরিচালিত হওয়া,

(৭) সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি কতিপয় সদ্‌গুণ। (এই ৭টী বিষয়ের বিবরণ প্রেমপ্রবন্ধে দেখ),

(৮) স্বার্থপরতা ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিভাজনের স্বার্থকেই নিজ স্বার্থ মনে করা,

(৯) ভক্তিভাজনের সুখশান্তি বাসনা করা ও তজ্জন্য চেষ্টা। যথা—পরলোকগতদিগের উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং ইহলোকস্থিতদিগের পার্থিবক্লেশনিবারণ। ইত্যাদি।

(১০) কৃতজ্ঞতা—উপকারীর নিকটে বিনীতভাবে উপকার স্বীকার করাকে কৃতজ্ঞতা কহে। যে ব্যক্তি, গুরুজনগণের নিকটে যে উপকার রাশি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে অথবা শক্তি সত্ত্বেও হৃদয়ঙ্গম না করে, তাহার নিকট ঐ উপকারীর উপকারের মহামূল্যভাব প্রতীয়মান হয় না, সুতরাং তাঁহার প্রতি মনও আকৃষ্ট হয় না। এজন্য কৃতজ্ঞতাকে ভক্তিবৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

(১১) ভক্তিভাজনের স্নেহানুভব—অমুক আমাকে স্নেহ করেন, ইহা অনুভব করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব স্বতঃই উদিত হয়। অতএব ভক্তিভাজনের স্নেহানুভবও ভক্তিবৃদ্ধির কারণ, সন্দেহ নাই।

(১২) অপরকে বিশেষতঃ আমরা যাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করি, সেই পিতা, মাতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে ভক্তি করিতে দেখিলেও ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

(১৩) সময়ে সময়ে দূরদেশে অবস্থান—এ বিষয়ের বিবরণও প্রেম-প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৪) সাদৃশ্যানুপাত—অর্থাৎ মাতা ও পিতা ভিন্ন অন্য যে সকল মহাত্মাদিগের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, তাঁহাদিগের সহিত সাদৃশ্যানুপাত থাকিলে সহজে ভক্তিসঞ্চার হয়। এই নিমিত্তই সাদৃশ্যানুপাতীয় গুরু হওয়া আবশ্যক।

(১৫) প্রেম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হইলেও পারে, না হইলেও পারে। কারণ প্রেম ভিন্ন অন্য যে যে গুণের যোগে ভক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাদিগের উন্নতি না হইলে ভক্তি-বৃদ্ধি না হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

(১৬) এতদ্ভিন্ন মহাত্মাদিগের অনুগ্রহে প্রাপ্ত বীজবিশেষ উচ্চারণ দ্বারাও ভক্তিবৃদ্ধি হইতে পারে। মূলকথা, হৃদয়ের উন্নতিই ভক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

ভক্তি হ্রাস কি কি কারণে হয়?

ভক্তির যে হ্রাস হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কারণ সমূহ নিবন্ধন ঐ হ্রাস সংঘটিত হয়। যে যে গুণে ভক্তির বৃদ্ধি হয়, তদ্বিপরীত গুণেই যে ভক্তির হ্রাস হইবে। এরূপ নহে। (ইহার কারণ প্রেমপ্রবন্ধে "প্রেমের হ্রাস" নামক অংশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে)। একারণ ভক্তির হ্রাসের বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

(১) জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিভাজনের অভিমত কার্য্য সম্পাদন না করিলে, ভক্তির হ্রাস হয়। এই কারণবশতঃ, মাতা পিতার শুশ্রূষা না করিলে, তাঁহাদিগের ক্লেশ নিবারণার্থে যথাসাধ্য চেষ্টাবান না থাকিলে এবং পরলোকগত মাতাপিতার উন্নতির নিমিত্ত আবশ্যকমত প্রার্থনা না করিলে ভক্তির হ্রাস হয়।

(২) ভক্তিভাজনে অবিশ্বাস দ্বারা ভক্তির হ্রাস হয়। কারণ যাহাকে বিশ্বাস বা প্রত্যয় না করা যায়, তাহার প্রতি স্নেহব্যতীত অন্য কোন সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৩) দোষানুশীলন, (৪) ঘোরতর স্বার্থপরতা—এই উভয়ের বিবরণ "ভক্তির উৎপত্তির ব্যাঘাত" অংশে লিখিত হইয়াছে।

(৫) ভক্তিভাজনের স্নেহে বঞ্চিত হওয়া—দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ভক্তি-ভাজন স্নেহ না করেন, তাহা হইলেও ভক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। স্নেহ-বারি-সেক-লাভব্যতীত ভক্তিলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বড়ই সুকঠিন।

(৬) কৃতজ্ঞতা লঘুতর হইলেও ভক্তির হ্রাস হয়।

(৭) এতদ্ভিন্ন করুণরস, মমতা প্রভৃতির হীনতায়ও ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। মূলকথা, হৃদয়ের উন্নতি অনুসারে যেমন ভক্তি বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ হৃদয়ের অবনতি অনুসারে, ভক্তির হ্রাসও হয়।

যেরূপ অন্যান্য গুণও প্রথমে কোন একটী সৃষ্ট আত্মার প্রতি না হইলে পূর্ণস্বরূপ অনাদি অনন্তের প্রতি যাইতে পারে না, তদ্রূপ ভক্তি গুণও প্রথমে কোন সৃষ্ট আত্মার প্রতি না হইলে ঈশ্বরের প্রতি যাইতে পারে না। অতএব ভক্তিসাধনা করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই মাতার ও পিতার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক। কারণ, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি ও অন্যান্য মহাত্মা-দিগের প্রতি ভক্তি, ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত দুইটীর অন্যতরটীর অবলম্বন করিলেও ভক্তি সাধনা হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐরূপ সাধনা অপেক্ষাকৃত ও ক্রমশঃ কঠিন। বিশেষতঃ মাতাপিতার প্রতি ভক্তি না করিলে ঐ ত্রুটির ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। (ভক্তিসঙ্কট দেখ)। অতএব মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তি করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তি করিলে, ঐ উভয় ভক্তি মিলিত ও আধ্যাত্মিক প্রেমের সহিত মিশ্রিত এবং তদ্দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি গমন করে, অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি উৎপন্ন করে। অনন্তর, যখন পার্থিবভক্তির পূর্ণতা ও লয় হয়, তখন কেবল ঈশ্বরভক্তি বিদ্যমান থাকে। পার্থিবভক্তির লয় হইলে আর

কিরূপে ভক্তি সাধনা করিতে হয়?

বিশেষরূপে ভক্তি সাধনার প্রয়োজন নাই। কারণ, তখন প্রেমসাধনা দ্বারাই, ভক্তিসাধনায় যাহা সাধনীয়, তাহা সাধিত হইয়া থাকে।

যদিচ দীক্ষাদাতা গুরু বা অন্যান্য মহাত্মাদিগের প্রতি প্রথমাবধিই প্রেম করিতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের নৈসর্গিক ভক্তিভাজন, সেই মাতা ও পিতার প্রতি অগ্রে ভক্তি না করিয়া বা পার্থিবভক্তি পূর্ণ না করিয়া, যদি কেহ তাঁহাদিগের প্রতি প্রেম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবেই সে ভক্তিসঙ্কটে পতিত হইল। এতাদৃশ বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার এজন্মে আর হইবার সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরে অন্য কোন রমণীর প্রতি (যাহার গর্ভে জন্মিবে তাহার প্রতি) ভক্তি সাধনা করিয়া ঐ ভক্তি পূর্ণ করিতে হয়। পরে পূর্ব্ব জন্মের মাতাপিতার প্রতি ভক্তিসাধনা করিয়া, ঐ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ভক্তি-সঙ্কট কি ?

অপর. কেহ কেহ মাতাপিতার প্রতি ভক্তি না করিয়া, প্রথমেই অন্য কাহারও প্রতি ভক্তি করে। ইহারাও ভক্তি সঙ্কটে পতিত, সন্দেহ নাই। কারণ, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি না করিলে, অনন্ত ন্যায়বান্ মঙ্গলময় পরম পিতার নিয়মানুসারে যাবৎ ঐ মাতাপিতার উদ্ধার না হইবে, তাবৎ তাহারও উদ্ধার নাই। যদি কোন আত্মা অতি উচ্চ স্থান হইতে আসিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন. তবে তাঁহাকেও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।

জগতে যত প্রকার সাধনা আছে, সকলই দুই প্রকার। যথা—অনুকূলভাবে সাধনা বা অন্বয়ি-সাধনা এবং বিপরীত ভাবে সাধনা বা ব্যতিরেকি সাধনা। মনে কর পানদোষাসক্ত ব্যক্তির পান দোষ দূর করিতে হইবে। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে ;—প্রথমতঃ অল্পে অল্পে কমাইয়া ঐ দোষ ত্যাগ

বিপরীত ভক্তি সাধনা কি ?

করান। ২য়তঃ, ঐ দোষের অতি বৃদ্ধি দ্বারা ঐ দোষ পরিহার করান। এই দুইটীর মধ্যে প্রথমটী অন্বয়ি-সাধনা ও শেষটী ব্যতিরেকিসাধনা। এইরূপ মনে কর, কোন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে কামদোষ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। উহাকেও অল্পে অল্পে ঐ দোষ হইতে নিবারিত করা, বা একেবারে ঐ দোষের অতি বৃদ্ধি দ্বারা ঐ দোষের দোষত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া উহা হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যক। এই দুইটীর মধ্যে, প্রথমটী অন্বয়ি-সাধনা ও শেষটি ব্যতিরেকি-সাধনা। আবার, মনে কর, কাহাকেও সরলতা শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমে উহাকে আপন পরিবার-বর্গের সহিত সরল ব্যবহার, পরে প্রতিবেশীদিগের সহিত, এবং সর্ব্বশেষে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সরল ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়া সরলতা শেখান যাইতে পারে। অথবা, কপটতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত করিয়াও তাহাকে সরল করা যাইতে পারে। উল্লিখিত সাধনাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি অন্বয়ি-সাধনা ও শেষটি ব্যতিরেকি সাধনা। উপরি উক্ত দৃষ্টান্তত্রয় হইতে ধর্ম্মার্থী অবশ্যই অন্বয়ি-ব্যতিরেকি-সাধনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, ব্যতিরেকি-সাধনা অপেক্ষা অন্বয়ি-সাধনা শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ, সত্যধর্ম্মাবলম্বিগণ অন্বয়ি সাধনা দ্বারা গুণ সাধন করেন এবং যোগানুষ্ঠানকারিগণ ব্যতিরেকি-সাধনা দ্বারা গুণ সাধনা করিয়া থাকেন। যদিচ শেষোক্ত পথাবলম্বীরা গুণসাধন যে করিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল না থাকায় উহাঁরাও কালে গুণ সাধনার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। (ইহকালে না হইলেও পরকালে হইবেন, সন্দেহ নাই)। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি স্ব-কৃত পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে এরূপ অবস্থায় পতিত হয় যে, অন্বয়ি সাধনা আর তাহাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তাহাদিগের পক্ষেই ব্যতিরেকি-সাধনা কর্ত্তব্য। ভক্তিবিষয়েও এইরূপ। স্ব-কার্য্য-

দোষে যাহারা প্রথমে নৈসর্গিক ভক্তিভাজন মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তি করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদিগের স্নেহের, বা ভক্তিহীনতানিবন্ধন ভক্তি-বিষয়ক দৃষ্টান্তের, অভাবপ্রযুক্ত মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি সাধনা করিতে পারে না এবং তাঁহাদিগের প্রতি অভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা-দিগের কর্ত্তব্য এই যে, বিপরীতভাবে ভক্তিসাধনা করে। অর্থাৎ দীক্ষা দাতা গুরু বা পারলৌকিক মহাত্মাদিগের প্রতি প্রথমে ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। এই ভক্তি করা অতি কঠিন নহে, কারণ, বিবিধ গুণসম্পন্ন মহাত্মার প্রতি স্বাভাবিক নিয়মে গুণাকর্ষণে আকৃষ্ট হৃদয় সহজেই ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া ধাবিত হইতে পারে। বিশেষতঃ, ঐ সকল মহাত্মার নিঃস্বার্থ স্নেহভাব দর্শন করিলে এবং তাঁহাদিগের হৃদয় ঈশ্বরভক্তিতে কিরূপ সমুজ্জ্বল, তাহা অনুভব করিতে পারিলে, সহজেই ভক্তির উদয় হয়। এইরূপে গুরুর প্রতি ভক্তি করিয়া ভক্তিসাধনা আরম্ভ হইলে, এবং হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইলে, সহজেই স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তি করিতে পারা যায়। ইহাকেই বিপরীতভাবে ভক্তি সাধনা বা ব্যতিরেকি ভক্তিসাধনা কহে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ১মতঃ, যে ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি নাই, যে নিরন্তর পাপকার্য্যে রত, পাপ করিতে করিতে অবশেষে সে কিরূপে ধর্ম্মপথে আসিবে? ২য়তঃ, যাহার ভক্তি নাই এবং যে অভক্তির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছে, সে কিরূপে ভক্তির প্রার্থী হইবে? এবং ৩য়তঃ, যে ব্যক্তি মাতাপিতার প্রতি অভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, সে কিরূপে গুরুর প্রতি ভক্তি করিতে পারিবে? এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তরদান অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ক্রমশঃ উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

আমাদিগকে প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক যে সকল মনোবৃত্তি

দিয়াছেন, তৎসমুদায় দ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়ই সম্পন্ন হইতে পারে। দেখ, পরদুঃখ হরণেচ্ছা দ্বারা যেমন পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে, তদ্রূপ পরের সামান্য দুঃখ দূর করিবার জন্য আত্মহত্যা স্বীকার করিলে উহাতে ঘোরতর পাপও হইতে পারে। এইরূপে কাম দ্বারা যেমন পাপ হইতে পারে, তেমনই উহার প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা জীবপ্রবাহ রক্ষা প্রভৃতি বহুপুণ্যও হইতে পারে। এ বিষয়ে আর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদিগকে দ্বিতীয়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, "মানবমন অত্যন্ত কার্য্যপ্রবণ, কোনরূপ কার্য্য না করিয়া উহা থাকিতে পারে না।" আপন আপন মনের প্রতি লক্ষ্য করিলে এবিষয়টী সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

আমাদিগকে তৃতীয়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, "কার্য্যের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উহার করণগুলির অবসাদ হয় এবং কার্য্যের পরাকাষ্ঠা হইলে, কার্য্যের করণগুলিরও অবসাদের পরাকাষ্ঠা হয়, অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা কার্য্য করিতে একেবারে অসমর্থ হইতে হয়। মনে কর, তুমি হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যখন ঐ পরিশ্রম অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইবে, তখন হস্তপদাদিও অবসন্ন হইয়া আসিবে। আর যখন ঐ পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা হইবে, তখন হস্তপদাদিরও অবসাদের পরাকাষ্ঠা হইবে, অর্থাৎ তুমি উহাদিগের দ্বারা কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে।

অপিচ, আমাদিগকে ৪র্থতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, "যাহা আমাদিগের ছিল, তাহার অত্যন্ত অভাব হইলে আমরা তাহার জন্য হাহাকার করি ও তাহা পাইবার জন্য স্বতঃই উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হই, অথবা যে যে পদার্থ আমাদিগের প্রাপ্য বলিয়া জানি, তৎসমুদায়ের

কিঞ্চিন্মাত্রও না পাইলে অত্যন্ত ব্যাকুল হই এবং প্রাপ্তির উপায় আশ্রয় করিয়া উহা পাইতে চেষ্টা করি। মনে কর, যাহার পুত্রকন্যাদি ছিল, সে যদি দৈবদুর্ব্বিপাকে সমস্ত সন্তান বিহীন হয়, তবে সে অবশ্যই হাহাকার করে ও সন্তান প্রাপ্তির জন্য পুনরায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় এবং যাহার কখনও সন্তান হয় নাই, সে যদি জানিতে পারে যে, সন্তান না হইলে পরলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তবে সেও হাহাকার করে বা অত্যন্ত অভাবসহকারে পুত্রপ্রাপ্তির উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অধর্ম্মকার্য্য করিতে করিতে অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অধর্ম্মসাধনী বৃত্তিগুলি অবশ্যই কার্য্যাক্ষম হইবে, আবার মন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং সে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি আশ্রয় করিবে? এইটী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার (Action and Reaction) ন্যায় তাহার ধর্ম্মকার্য্য সাধনের মূল। অথবা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই পুনরায় ব্যতিরেকমূখী হইয়া যাইবে। এইরূপেই (১মতঃ) অতিশয় অধর্ম্মাচারিগণ ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

অপর, যাহারা ভক্তির কণামাত্র লাভ করিয়াও অভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ৪র্থ স্বীকৃতের ১ম অংশ অনুসারে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হইবে। আর যাহারা জন্মাবধি ভক্তির মুখ দেখে নাই এবং কার্য্য দোষে অভক্তির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছে, তাহারাও ৪র্থ স্বীকৃতের ২য় অংশ অনুসারে, ভক্তি করা তাহাদিগের উচিত বলিয়া যখন জানিতে পারিবে, তখন উহার জন্য ব্যাকুল হইবে এবং উহা পাইবার উপায় আশ্রয় করিয়া, তাহা পাইতে চেষ্টা করিবে।

এখন দেখ, যে যখন ভক্তির প্রার্থী হইবে, তখনই সে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিবে এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া যখন দেখিতে পাইবে যে, একেবারে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করা অসাধ্য, তখনই গুরুর প্রতি ভক্তি

করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপেই (২য়তঃ) যাহার ভক্তি নাই ও যে অভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ভক্তির প্রার্থী হয় এবং এইরূপেই (৩য়তঃ) যে ব্যক্তি মাতাপিতার প্রতি অভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে গুরুর প্রতি ভক্তি করিতে পারে।

ভক্তি মানবাত্মাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, সদ্‌গুণের আদর করিতে এবং প্রথমে অননুভবনীয় প্রেমের অসীম মাধুর্য্যের কিয়দংশ অনুভব করিতে শিক্ষা দেয়। ভক্তি প্রভাবে হৃদয়ের বহুতর দোষ দূরীকৃত হয়, প্রবল রিপুকুল প্রশান্ত হয়, স্বার্থপরতা দূরে যায়, এবং জীবন চরিতার্থ হয়। মূলকথা, যে অনন্ত গুণসাধ্য সুধা-

ভক্তির শক্তি কি? কার্য্য কি? (৪)

(৪) ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য নারদকৃত ভক্তিসূত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "কস্তরতি কস্তরতি মায়াং? .... যঃ .... বেদানপি সংন্যসতি কেবল মবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে, স তরতি, স তরতি, স লোকান্ তারয়তীতি।"

"ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ। কণ্ঠাবরোধ রোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি, সুকর্ম্মী কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রী শাস্ত্রাণি। তন্ময়াঃ.... মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি। নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যা রূপকুলধন ক্রিয়াদি ভেদঃ। যতস্তদীয়াঃ।"

অর্থাৎ কে মায়াকে তরে, কে মায়াকে তরে? যে বেদ সকলও নিক্ষেপ করিয়া কেবল অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করে, সে ত্রাণ পায়, সে ত্রাণ পায় এবং অন্যলোকদিগকেও উদ্ধার করে। ভক্তেরা অত্যন্ত প্রধান। যখন তাঁহারা কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুর সহিত পরস্পর আলাপ করেন, তখন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বংশ ও পৃথিবীকে পবিত্র করেন। ভক্তেরা তীর্থকে তীর্থীভূত, কর্ম্মকে সুকর্ম্মীভূত, এবং শাস্ত্রকে সচ্ছাস্ত্রীভূত করেন। ভক্তেরা তন্ময়, অর্থাৎ ব্রহ্মময়, কারণ সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস থাকাতে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন। যেখানে ভক্ত থাকেন, তথায় পিতৃগণ আমোদিত হন, দেবগণ নৃত্য করেন এবং এই পৃথিবী সনাথা হয়। ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদির ভেদ নাই। কেননা তাঁহারা সকলেই যে ঈশ্বরের সন্তান, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন।

ময়ী অবস্থার জন্য মানবাত্মা নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, যাহা না পাইলে আত্মার স্থিরতা কখনও হইতে পারে না, ভক্তি তাহার একটী প্রধান অংশ প্রদান করে। ভক্তিসাধনা ব্যতীত আত্মার অভাব দূর হয় না, উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এবং হৃদয় উপযুক্তরূপে কার্য্যক্ষম ও উন্নত হইতে পারে না। প্রেম, প্রেমভাজনে নিঃস্বার্থভাবে আত্মসমর্পণ করায়; ভক্তি, ভক্তিভাজনের আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয় জ্ঞানে প্রতি-পালন করাইতে প্রবর্ত্তিত করে। ভক্তি শুষ্কহৃদয়ে রসসঞ্চার করে, প্রেম তাহাকে রসময় করে। ভক্তি মুক্তিপথে অগ্রগামী করে, প্রেম মুক্তিপ্রদান করে। ইত্যাদি। মানবাত্মা যতই উন্নত হউক না কেন, ঈশ্বরভক্তি জন্মিলেও পতনের ভয় থাকে এবং অবিশ্বাসও আসিতে পারে, কিন্তু প্রেম নির্ভরতা হৃদয়ে দান করিয়া ভক্তের পতনভয় দূরীভূত করে ও বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করে। ভক্ত, ঈশ্বরগুণসমূহে বিশ্বাস করিয়া অভয় হন, কিন্তু প্রেমিক একেবারে অকুতোভয় হন। ভক্ত নিজে হাসিতে পারে, কাঁদিতে পারে, ও পাগল হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিক নিজে হাসিয়া হাসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ও পাগল হইয়া সমুদায় বিশ্বরাজ্যকে হাসাইতে, কাঁদা-ইতে ও পাগল করিতে পারে। ভক্ত কেবল স্ব-রক্ষার্থে সক্ষম, কিন্তু প্রেমিক নিজের কথা দূরে থাকুক, সকলকেই বাঁচাইতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেমন সুপরিপক্ক অত্যুৎকৃষ্ট রসাল ফলের অম্লমধুর রস অন্য ফলরসে অনুপমের, তদ্রূপ প্রকৃতপথ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ঈশ্বররাজ্যে গমন করেন, তাঁহারাও এরূপ একটী গুণসাধ্য অনুপম অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, উহাও অম্লমধুর অর্থাৎ—ভক্তি প্রেম মিশ্রিত। ঐ অবস্থাটীকে কেহ মুখ্যাভক্তি, কেহ প্রেম বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ উহা ভক্তি-প্রেম। যেমন রসালের অম্লত্ব দূর করিতে গেলে মধুরত্ব থাকে না এবং ঐ অম্লত্বই মধুরত্বে

অতৃপ্তির কারণ, আর যেমন উহার মধুরত্ব দূর করিতে গেলেও অম্লত্ব পূর্ব্বাবস্থ না থাকায় সুখাবহ হয় না, তদ্রূপ ঐ অন্তিম ফলরূপ অবস্থা লাভ করিতে গেলেও একটী দ্বারা হইবে না। উভয়েরই (ভক্তি ও প্রেমেরই) প্রয়োজন।

ভক্তির লয় কি ?

ঈশ্বরপ্রেম পূর্ণভাবে কখনও হয় না বলিয়া, ঈশ্বর ভক্তিরও কখনই লয় হইতে পারে না। কিন্তু পার্থিব ভক্তির লয় আছে, কারণ উহা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে না। যখন পার্থিব ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তির পূর্ণতা হয় এবং যখন পার্থিব ভক্তি-ভাজনের প্রতি প্রেমসাধনা আরম্ভ হয়, তখনই পার্থিব ভক্তির লয় হয়। পরন্তু ইহা অতি সুকঠিন। এই পার্থিব ভক্তির লয় সাধনার্থে বা পার্থিব ভক্তিকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য কত শত মহাত্মা পুনঃ পুনঃ জঠরযন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হন। যেহেতু জন্মান্তরে ঐ কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজে হইতে পারে। পার্থিব ভক্তির লয় সাধনা এতই দুরূহ যে ভূমণ্ডলে ঐ রূপ অবস্থা কতিপয় মাত্র মহাত্মার হইয়াছিল, হইতেছে বা হইবে

সত্যধর্ম্ম।

একাগ্রতা।

মুখবন্ধ।

একাগ্রতা কাহাকে কহে? এই বিষয়ে কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে, যে বিষয়টী সর্ব্ব সাধারণে শ্রবণমাত্র বুঝিতে পারেন তাহার সংজ্ঞা করিতে গেলেই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। যেমন সরলরেখা কাহাকে বলে, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে, কি "দুই বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্বকে সরল রেখা কহে" কিংবা "যদি দুই রেখা এরূপ হয় যে, তাহাদিগকে একাধিক বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই তাহারা সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তবে তাহাদিগের প্রত্যেককে সরল রেখা কহে।" ইত্যাদি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া, যদি সরল রেখা বুঝা তে চেষ্টা করা যায়, তবে যে সরলরেখা-জ্ঞান অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। এইরূপ, "গমন" বা "যাওয়া" কাহাকে কহে, সকলেই জানে, কিন্তু যদি, "উত্তর দেশ সংযোগ ধ্বংসানন্তর পূর্ব্ব-দেশ-সংযোগানুকূল ব্যাপারাবচ্ছেদাবচ্ছিন্নতাকে গমনত্ব কহে" এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করা যায়, তবে যে, শতকরা ২।১ জন ভিন্ন উহা কেহই বুঝি..ত পারে না, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। ইত্যাদি। এইরূপ যে কোন বিষয়ই অবলম্বন করা যাউক না কেন, সুখ-বোধ্য বিষয়ে সূত্র

নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সংজ্ঞা লিখিতে গেলেই, উহা দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। তথাপি গ্রন্থ লেখকগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্তরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিলে জন-সমাজে অজ্ঞ অথবা অঙ্গহীন কার্য্যকারী বলিয়া নিন্দিত বা অপবাদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধ লেখক পার্থিব লোকের নিন্দা বা অপবাদে ভীত নহে, বরঞ্চ উহা শিরোভূষণ রূপে ধারণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু যে মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয়ে—যে পূর্ণ ও অনন্ত ভাবময় ধর্ম্মের অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, পাছে ভ্রান্ত লোকে ভ্রান্তিক্রমে তাহাতে ন্যূনতার বা হীনতার আশঙ্কা করে, পাছে সেই পবিত্রতম পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ ধর্ম্মে কোন বিষয়ের অভাব আছে বলিয়া এক ব্যক্তির মনেও ক্ষণকালের জন্যেও অণুমাত্র ভাব সমুদিত হয়, পাছে এই লেখকের কার্য্যদোষে বা উদাসীনতায়, ভ্রান্তি পরিচালিত বহু সংখ্যক উদ্ভ্রান্ত মানব পূর্ণ সত্যে অপূর্ণতার আশঙ্কা করিয়া পাপ পূর্ণ হয়, তজ্জন্যই একাগ্রতার লক্ষণাদি পশ্চাৎ সন্নিবেশিত হইল।—

মূপবন্ধের অন্তিম ভাগে বক্তব্য এই যে, যে মহাত্মা যে গুণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, যিনি যে গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি কেবল আশীর্ব্বচনে নহে, কিন্তু স্বকৃত সাধনে যে গুণের গুণাবলী পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই সেই গুণের বিষয়ে বর্ণনা করিতে সমর্থ; সুতরাং মাদৃশ লেখকের এতাদৃশ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অসম-সাহসিকের কার্য্য বলিতে হইবে, সুতরাং এ বিষয়ে নিবৃত্ত থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, যাঁহার আশীর্ব্বাদে সাধনা নিরপেক্ষ হইয়াও নিখিল গুণরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহার কৃপায় সগুণ সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া নির্গুণ ও নিষ্কাম ভাব লাভ করা যায়, এবং যিনি অনন্তপ্রায় মণ্ডলের হিত সাধনে নিরন্তর নিযুক্ত, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সেই অবাঙ্‌মনস গোচর পরম পিতার মঙ্গল

চরণে প্রণিপাত করিয়া—তাঁহার অনন্ত গুণ বিধায়ক সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক পরমোৎসাহ দায়ক মঙ্গলচরণ, শরীর, মনঃ, বাক্য ও আত্মা দ্বারা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, নিরাশ্রয়ের পরমাশ্রয় তদীয় আশ্রয় অবলম্বন করিয়া, এই সুমহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। প্রার্থনা করি যেন, পরম পিতার কৃপায় এবং গুরুদেবের অনুগ্রহে এই বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে নির্ব্বিঘ্নে এ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই।

সত্যধর্ম্ম।

একাগ্রতা।

এক কি ?

একাগ্রতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে এক কি ? এবং অগ্র কি ? ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক। এজন্য ঐ দুইটীর বিষয় অগ্রে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। যাহাতে জাতিগত, শ্রেণীগত বা সংজ্ঞাদিগত পৃথকত্ব নাই, তাহাই এক। এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু অন্যের অসংসৃষ্ট বোধ করা যায়, বা যাহা দ্বিত্ব বহুত্বাদি সংখ্যাবিমুক্ত প্রতীয়মান হয়, অথবা যাহাকে লয়শীল গণনা-গুণের মূল বোধ করা যায়, তাহাকে এক কহে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অধিকারিভেদে এক শব্দার্থও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অভেদ জ্ঞানের উন্নতি জনিত অভেদ সংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে, আমাদিগের মধ্যে কাহারও হৃদয়ে দৃশ্যমান শত জনকে জনত্বের শতটী এক বলিয়া, কাহারও মনে পাঁচটী এক বলিয়া এবং কাহারও অন্তঃকরণে একটী মাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপ কোন কোন মহাত্মার নিকট শত শত মণ্ডল এক বলিয়া বোধ হয়। আর যিনি অনাদি অনন্ত ও যাঁহার সম্যক্‌ বর্ণনা করা কোনও ভাষার সাধ্য নহে, সেই অনন্ত-উন্নত-অনন্ত-গুণের অনন্তরূপে অনন্তনিধান পরম পিতার নিকটে সমস্তই এক। সুতরাং 'এক' জ্ঞানের বিভিন্নতা-নিবন্ধন একাগ্রতাও ব্যক্তি বিশেষের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

অগ্র কি ?

অভিধানে অগ্রশব্দের নানাবিধ অর্থ লিখিত আছে ; যথা—

অগ্রং পুরস্তা দুপরি পরিমাণে পলস্য চ।
আলম্বনে সমূহে চ প্রান্তে চ স্যান্নপুংসকং।
অধিকে চ প্রধানে চ প্রথমে চাভিধেয়বৎ ॥ ইতি মেদিনী।

অর্থাং, অগ্র শব্দের অর্থ পুরোভাগ, উপরিভাগ, পল-পরিমাণ, আলম্বন (অবলম্বন), সমূহ, প্রান্ত, অধিক, প্রধান ও প্রথম।

এই সকল অর্থের মধ্যে প্রথম, অবলম্বন, প্রধান ও সমূহ এই চারি প্রকার অর্থই "একাগ্রতা" পদে অগ্রশব্দের অর্থ। অতএব "এক বিষয়ে নিবিষ্টতাকে একাগ্রতা কহে" একাগ্রতার এই সাধারণ লক্ষণ হইলেও উহার বিশেষ লক্ষণ আছে। যথা—

একাগ্রতা কাহাকে কহে ?

যে গুণ দ্বারা একটী পদার্থ প্রথমে লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু হয় ত পরিশেষে অপর পদার্থেও মন যাইয়া থাকে, বা যেগুণ দ্বারা একটী মাত্র পদার্থ অবলম্বন করিয়া মনঃ স্থির থাকে, সুতরাং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়াতে অপর পদার্থে মনের গতি হয় না, কিংবা যেগুণদ্বারা একটী পদার্থ প্রধান লক্ষ্য হয়, কিন্তু অন্যান্য পদার্থও অগোচর থাকে না। অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কদাচ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইতে হয় না বটে কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, অথবা যেগুণদ্বারা বহুপদার্থ বা অনন্ত পদার্থ এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে একাগ্রতা কহে। ফলতঃ, যেগুণ দ্বারা একই পদার্থ অগ্ররূপে (প্রথম, অবলম্বন বা প্রধানরূপে) অবলম্বিত হয় কিংবা অগ্র অর্থাং সমূহ পদার্থ একরূপে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ একের অন্তর্গত করা যায়, তাহাকে একাগ্রতা

কহে অর্থাৎ যেগুণে অবস্থা বিশেষে অবলম্ব্য পদার্থকে প্রথমে অবলম্বন করা যায়, বা দৃঢ়াবলম্বন করা যায়, কিংবা প্রধানরূপে আশ্রয় করা যায় অথবা বহুসংখ্যক পদার্থকে এক পদার্থরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহাকে একাগ্রতা কহে। যদি কেহ কোন বিষয়ক চিন্তায় এরূপে ব্যাপৃত হন যে, ঐ বিষয়ে মনঃ স্থির হইতে না হইতে অন্য বিষয়ে চলিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার চেষ্টা সহকারে ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ না করিলে মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়, তবে তাঁহারও যে ঐ বিষয়ে একাগ্রতা আছে, এরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ একাগ্রতা, একাগ্রতার অঙ্কুর বা প্রথম অংশ মাত্র।

যদি কেহ কোন বিষয়ের চিন্তায় এরূপ নিবিষ্ট হন যে, তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিলে তিনি জানিতে পারেন না, কথা কহিলে শুনিতে পান না, সম্মুখে দাঁড়াইলে দেখিতে পান না, গাত্রস্পর্শ করিলে অনুভব করিতে পারেন না, পুষ্পাদির সৌরভ বা দুর্গন্ধ পদার্থের পূতিগন্ধ নাসিকার নিকটে ধরিলে গন্ধবোধ করিতে পারেন না, রসনার উপরিভাগে কোন সুস্বাদ বা অতি বিস্বাদ পদার্থ রাখিলে স্বাদ বোধ করিতে পারেন না, তবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার একাগ্রতা হইয়াছে, কিন্তু ইহা চতুর্ব্বিধ একাগ্রতার ২য় অংশ মাত্র।

যদি কোন ব্যক্তি আপনার প্রকৃত প্রেমের পাত্রীকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করেন, অথচ নিখিল সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক কার্য্য করিতেও ত্রুটি না করেন, তবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি স্ত্রীর প্রতি একাগ্র হইয়াছেন। যদি কেহ মাতা পিতার প্রতি মনোনিবেশ করেন, অথচ অত্যাবশ্যক সমস্ত কার্য্যও করেন, তথাপি বলা যাইতে পারে যে তাঁহার মাতা পিতার প্রতি একাগ্রতা আছে। এইরূপ স্নেহাস্পদ প্রভৃতি যাবতীয় মমতা ভাজন সম্বন্ধেই জানিবে। এইরূপ একাগ্রতা পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রকার একাগ্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই একাগ্রতার তৃতীয় অংশ। অতএব একাগ্রতার

৩য় অংশ লব্ধ হইলে নিরন্তর জগদীশ্বরে চিত্ত রাখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল কার্য্যও করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি আপনার অভীষ্ট কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে এরূপে দেখিতে পান যে, অন্য যাহা কিছু দেখেন, তৎসমুদায়ই উহার মধ্যে দেখিতে পান কিংবা সর্ব্ব বস্তুতেই তাহাকে দেখিতে পান, তবে তাঁহার একাগ্রতার পরম উন্নতি হইয়াছে, এরূপ বলা যায়। কেন না, ইহাই একাগ্রতার চতুর্থ বা অন্তিম অংশ।

সূর্য্য কিরণাদি জ্যোতিঃ পদার্থ ব্যতীত কোনও বস্তু নিরীক্ষিত হইতে পারে না, কিন্তু কেবল জ্যোতিঃ পদার্থ থাকিলেই দর্শন জ্ঞান জন্মে না, কেন না আলোক ও উদ্ভূতরূপতা এই উভয়ের এক কালীনতা ব্যতীত কোনও পদার্থ অবলোকিত হয় না। দেখ, দিবাভাগে যখন সূর্য্য কিরণ বিদ্যমান থাকে, তখনও আমরা বায়ু দেখিতে পাই না, কারণ বায়ুর * উদ্ভূতরূপতার অভাব বা অত্যল্প উদ্ভূতরূপতা বশতঃ এবং অত্যন্ত স্বচ্ছতা নিবন্ধন উহা আমাদিগের নয়নগোচর হইতে না হইতেই উহার অপর পার্শ্বস্থ অধিকতর উদ্ভূতরূপতা বিশিষ্ট পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। অপর, প্রজ্বলিত চুল্লীর উপরিস্থিত কটাহের মধ্যবর্ত্তী তৈল (যাহা অল্পক্ষণ পরেই জ্বলিয়া উঠিবে) দর্শন করিয়াও উহাতে তেজের সত্তা অনুভব করা যায় না, কারণ ঐ তেজের তৎকালে উদ্ভূতরূপতা থাকে না! অতএব সমস্ত পদার্থের দর্শন বিষয়ে আলোকের ন্যায় উদ্ভূতরূপতা ও একটী প্রধান কারণ। আধ্যাত্মিক জগতে প্রেম ঐ আলোকের প্রতিরূপ এবং একাগ্রতা ঐ উদ্ভূতরূপতার স্থানীয়। দেখ, বাহ্য জগতে যেমন সূর্য্যাদির আলোক ও উদ্ভূতরূপতা ব্যতীত কোনও পদার্থের বিকাশ হয় না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতে প্রেম ও একাগ্রতা ব্যতীত কোনও গুণের উৎপত্তি, বৃদ্ধি বা উন্নতি ও লয় হইতে পারে না। যেমন বাহ্য জগতে

---

* মূল বায়ুর রূপ নাই।

সূর্য্য হইতে সমস্ত মণ্ডল উৎপন্ন হয়, সূর্য্য প্রভাবে স্থিতি করে এবং কালে সূর্য্যে বা তন্নিঃসৃত কোনও মণ্ডলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে বিলীন হইতে পারে, কিন্তু কি সূর্য্য, কি তন্নিঃসৃত অন্যান্য মণ্ডল তৎসমুদায়ে উদ্ভূত-রূপতা না থাকিলে এই সকল ঘটনা জ্ঞান গোচর হয় না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতে সমস্তগুণই প্রেম হইতে সমুৎপন্ন, প্রেম প্রভাবে স্থিত ও প্রেমে লীন হইতে পারিলেও কি প্রেম, কি অন্যান্যগুণ তৎসমুদায়ের সহিত একাগ্রতার সংযোগ না হইলে ঐ সকল কখনই বিকসিত হইতে পারে না। অতএব একাগ্রতা প্রেমের রমণীয়তা ও উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে, একাগ্রতা ভক্তিকে সম্বর্দ্ধিত ও লয়াভিমুখে পরিচালিত করে, একাগ্রতা বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত ও অনন্তাভিমুখে প্রধাবিত করে, একাগ্রতা নির্ভরতার প্রভাববত্তা বর্দ্ধিত করে এবং একাগ্রতা প্রভাবেই ভক্তি ও প্রেমের মধুময় সংযোগ সম্পাদিত ও তাহা হইতে শ্রদ্ধাগুণ সমুৎপন্ন হয়।

কোনও কোনও গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, "যেমন চঞ্চল পদার্থের উপরিভাগে অপর কোনও পদার্থই দৃঢ়ভাবে ধৃত বা স্থিত হয় না, অথবা তাহা ভেদ করিয়া কোনও পদার্থ সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ অস্থির (একাগ্রতা বিহীন) হৃদয়ে (বা হৃদয় দিয়া) প্রেমের দৃঢ়াবস্থান অসম্ভব।" অতএব একাগ্রতা দ্বারা প্রেমবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য যে, কেবল প্রেম কেন, নিখিল গুণই একাগ্রতা সহযোগে বর্দ্ধিত, উৎপত্তিশীল গুণ উৎপন্ন ও লয়শীল গুণ সমূহ লীন বা লয়াভিমুখে ধাবিত হয়। দেখ, যে উপাসনা মানব জীবনের পরম প্রয়োজনীয়, যে উপাসনা ধর্ম্মে অবস্থিতির শ্রেষ্ঠতম উপায়, যে উপাসনা পশুত্বের বিনাশিনী ও মনুষ্যত্বের জননী, যে উপাসনা পাপমুক্তি বিধায়িনী, যে উপাসনা স্তন্যামৃত দায়িনী জীবন রক্ষিণী জননীর ন্যায় মধুময় অমৃতময় আত্মপ্রসাদ দায়িনী এবং যে উপাসনা মনের দৃঢ়তা আত্মার সতেজভাব ও সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞান প্রদায়িনী, সেই বলশান্তি-

বিধায়িনী উপাসনাই একাগ্রতার অভাবে সুসম্পাদিত হয় না। অতএব একাগ্রতা আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভের প্রশস্ত পথ। দেখ, একাগ্রতা না থাকিলে "সাধক" হওয়া যায় না, একাগ্রতা না থাকিলে জ্ঞানের উন্নতি হয় না, এবং একাগ্রতা না থাকিলে সূক্ষ্মদেহধারী আত্মাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যেগুণে অপরাপর গুণের গুণত্ব সাধনে প্রেমের পরম সহায়তা করে, যেগুণ প্রেমগুণের সহিত মিলিত হইলে মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া উঠে, যেগুণ আমাদিগের বাল্য-সুলভ হইলেও যৌবন ও বার্দ্ধক্যের কথা দূরে যাউক, বহু জন্মেও সাধনীয়, যেগুণ প্রভাবে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রথমে একে স্থিরতর হইয়া, পরে একে বহুত্বের লয় সম্পাদন করে, যে গুণের সাহায্যব্যতীত দূরদর্শনময় ও ভাবিজ্ঞানময়অবস্থা সমুৎপন্ন ও প্রেমময় অবস্থা বিকসিত হইতে পারে না, যেগুণ প্রত্যেক কৃচ্ছ্র সাধনায় পরম সাহায্য প্রদান করে এবং যেগুণ ব্যতীত আত্মার উৎকর্ষ অর্থাৎ গুণ সমূহের উপলব্ধি কিছুতেই হয় না, তাহাকে একাগ্রতা কহে। ফলতঃ, আত্মার শান্তি, মনের স্থিরতা প্রভৃতি যাহা যাহা মানব জীবনে প্রার্থনীয় তৎসমুদায়ের অধিকাংশই যে, একাগ্রতা সাপেক্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, একাগ্রতা মানবাত্মার একটী মহান্ গুণ।

একাগ্রতা কিরূপ গুণ?

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক গুণসমূহ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা—সরল, মিশ্র ও জাতগুণ। সরল ও মিশ্র গুণ আবার প্রত্যেকে লয়-শীল ও অলয়-শীল ভেদে দ্বিবিধ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, গুণের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ভেদে ঐ বিভাগ

হইয়াছে। কিন্তু গুণের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে, উহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—কোমল ও তেজোময় বা কঠোর গুণ। প্রেম, ভক্তি, কাম প্রভৃতি কোমল গুণের এবং জ্ঞান, বিশ্বাস, ক্রোধাদি তেজোময় গুণের অন্তর্গত। সুতরাং আধ্যাত্মিক গুণ সমূহ দশ ভাগে বিভক্ত। যথা,—

(১) সরল কোমল অলয়-শীল, যথা প্রেমাদি।

(২) সরল কোমল লয়শীল, যথা মমতা প্রভৃতি।

(৩) সরল কঠোর অলয়শীল, যথা জ্ঞান প্রভৃতি।

(৪) সরল কঠোর লয়শীল, যথা বহুত্ব বোধাদি।

(৫) মিশ্র কোমল অলয়শীল, যথা ঈশ্বর ভক্তি প্রভৃতি।

(৬) মিশ্র কোমল লয়শীল, যথা পার্থিব ভক্তি প্রভৃতি।

(৭) মিশ্র কঠোর অলয়শীল, যথা বিশ্বাসাদি।

(৮) মিশ্র কঠোর লয়শীল, যথা সৃষ্টদিগের প্রতি আত্মোন্নতি বোধ প্রভৃতি।

(৯) জাত কোমল লয়শীল, যথা কাম প্রভৃতি।

(১০) জাত কঠোর লয়শীল, যথা ক্রোধ প্রভৃতি।

(জাত গুণ সমূহের অলয়শীলত্ব নাই।)

একাগ্রতা উক্ত দশ প্রকারের মধ্যে তেজোময় অলয়শীল সরলগুণ অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার গুণ। যেমন প্রকৃতি পুরুষ যোগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যেমন রস ও তেজঃ সংযোগে উদ্ভিদাদির দেহ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতেছে এবং যেমন শুক্র শোণিত সংযোগে মনুষ্যাদির দেহ জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রেম ও একাগ্রতার যোগে প্রেমোৎপাদ্য যাবতীয় গুণ উৎপন্ন হয়।

একাগ্রতার উৎপত্তি আছে কিনা?

একাগ্রতা সরল গুণ হইলেও ইহার উৎপত্তি আছে। কেননা, যখন একাগ্রতার প্রথম অংশ "একে ক্ষণ-নিবিষ্টতা" বা বিক্ষিপ্ততাকে প্রকৃত একাগ্রতার অঙ্কুর বলা যায় এবং যখন ঐ অঙ্কুর হইতে অঙ্কুরজ 'একনিবিষ্টতার' পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তখন একাগ্রতার যে উৎপত্তি আছে, তাহাতে আর সংশয় কি?

কিরূপে একাগ্রতার উৎপত্তি হয়?

প্রেমভক্তি প্রভৃতি যে সকল গুণে একাগ্রতার বৃদ্ধি হয়, তৎসমুদায়ের সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে, যখন বিক্ষিপ্তচিত্ত কোনও এক বস্তুতে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত নিবিষ্ট হইতে থাকে, তখনই যে একাগ্রতার উৎপত্তি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপেই একাগ্রতার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সাধারণত অনেকেরই সংস্কার আছে যে, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা কিরূপে সরল গুণ হইতে পারে? এই সংস্কারের ভ্রান্ততার বিষয় বর্ণনা করা বাহুল্য। নিবিষ্ট-চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, অঙ্কুর থাকিলে উৎপত্তির ব্যাঘাত কি? অঙ্কুরের বিকাসই যখন উৎপত্তি, তখন সরল গুণেরও যে উৎপত্তি আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখ, অভেদ জ্ঞান, সোহং জ্ঞান প্রভৃতি সরল গুণ হইয়াও যথাক্রমে সরল-গুণ প্রেম ও অভেদজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং শ্রদ্ধা সরলগুণ হইয়াও সরলগুণ প্রেম ও মিশ্রগুণ ভক্তির সংযোগে সমুৎপন্ন হয়। অতএব উৎপত্তি থাকিলেই সরলগুণ হইবার বাধা থাকে না। সুতরাং একাগ্রতার উৎপত্তি আছে বলিয়া উহা যে সরলগুণ হইতে পারিবে না, এরূপ নহে, কেননা উহার অঙ্কুর আত্মাতে বিদ্যমান আছে। (ক)

(ক) জ্ঞানার্থী পাঠকের নিকট বলা বাহুল্য যে, উৎপত্তি শব্দের অর্থ জন্ম ও

একাগ্রতার উৎপত্তি ও ঐ উৎপত্তির ব্যাঘাত প্রভৃতি বিষয় পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, সম্প্রতি উহার বিভাগের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

একাগ্রতার বিভাগ।

একাগ্রতা ৪ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা,—

(১) একে ক্ষণিক-নিবিষ্টতা বা বিক্ষিপ্ততা।

(২) এক নিবিষ্টতা

(৩) একলক্ষ্য প্রধানতা

(৪) একত্বময়তা বা পূর্ণ একাগ্রতা।

একাগ্রতার বিভাগের বিবরণ।

একাগ্রতার প্রথম অংশে মনঃ বহু পদার্থে, ক্রমানুসারে বা অক্রমে পূর্ব্ব গৃহীত বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবেশ করে, ও অত্যল্প ক্ষণ অবস্থিতি করিয়াই পদার্থান্তরে প্রবিষ্ট হয়। এ অবস্থায় একাগ্রতার স্থায়ী ভাব লক্ষিত হয় না, বলিয়া ইহাকে বিক্ষিপ্ততা কহে এবং একাগ্রতার অল্পকাল স্থায়িত্ব নিবন্ধন ইহাকে "একে ক্ষণিক নিবিষ্টতা" কহা যায়। এই অবস্থাই সাধারণতঃ বাল্য জীবনে পরিলক্ষিত হয়।

একাগ্রতার দ্বিতীয় অবস্থায় মন বিষয়ান্তর হইতে আকৃষ্ট হইয়া একটী বস্তুতে বহুক্ষণ থাকে, একারণ ইহাকে "এক-নিবিষ্টতা" কহে। এই

আবির্ভাব। সরল গুণ সম্বন্ধে জন্ম ও আবির্ভাব অর্থাৎ বিকাশ বাস্তবিক একই অর্থের প্রকাশক, কিন্তু আপাততঃ ভিন্নার্থক বলিয়া বোধ হয়। দেখ, বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে এবং কুসুমকোরক হইতে পুষ্পের বিকাশ বা আবির্ভাব হয়। এই দুইটী স্থলের মধ্যে প্রথম স্থলে যে বীজ মধ্যে অঙ্কুরাদির সত্তা ছিল, তাহারই বিকাশ হইয়াছে এবং শেষোক্ত স্থলেও ঐরূপ জানিবে। সুতরাং সরলগুণ সম্বন্ধে জন্ম ও আবির্ভাব বস্তুতঃ একই ভাব-প্রকাশক।

অবস্থাই শাস্ত্রে একাগ্রতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যোগ সাধকেরা এই একাগ্রতা লাভের জন্যই সদ্‌গুণরাশি বিনষ্ট করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, এই অংশই যে প্রকৃত একাগ্রতার পূর্ব্বাবস্থা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থাই সাধারণতঃ যৌবন কালে অনুভূত হয়।

একাগ্রতার তৃতীয় অবস্থায় মন একটী বিষয়ে বহুক্ষণ নিবিষ্ট থাকে, কিন্তু সেই বিষয় ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয়ও জানিতে পারে, পরন্তু ঐ সকলের জ্ঞান মুখ্যভাবে না হইয়া আনুষঙ্গিক ভাবে হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কদাচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না কিন্তু অলক্ষিত বিষয়ও আনুষঙ্গিক সম্পাদিত ও পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহাকে "একলক্ষ্য-প্রধানতা" কহে। এই অবস্থা মানবীয় প্রৌঢ় জীবনের প্রতিরূপ।

একাগ্রতার চতুর্থ অবস্থায় একটী বিষয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা, নিবিষ্ট থাকা যায় এবং ঐ লক্ষ্য বিষয় ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত বা জ্ঞাতাদি হয়, তৎসমুদায় লক্ষিত বিষয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ তখন সগুণ সাধনা অতিক্রান্ত হয় ও নির্গুণ সাধনায় প্রবৃত্ত থাকা যায়, এজন্য সমুদায়ই এক বলিয়া দৃঢ় জ্ঞান জন্মে, এই একত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, দ্বিত্ব-বহুত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এবং দ্বিত্ব বহুত্বাদির বিলোপে লক্ষ্য বা জ্ঞেয় বিষয়ের একত্ব সম্পাদিত হইতে থাকে, সুতরাং যখন যাহাতে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাহার অন্তর্গত করিয়া দেখিতে পারা যায়। এ কারণ এই অবস্থাকে "একত্ব-ময়তা" বা "পূর্ণ একাগ্রতা" কহে। এই মহতী অবস্থা বার্দ্ধক্যাবস্থার প্রবর্ত্তক।

অতএব যেমন গানময়, দূরদর্শনময়, ভাবিজ্ঞানময় ও প্রেমময় এই অবস্থা চতুষ্টয় অনুসারে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই চারিটী অবস্থা সংঘটিত হয়, তদ্রূপ একাগ্রতার উল্লিখিত অবস্থা চারিটী দ্বারাও

বাল্যাদি চারিটী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যেমন স্বার্থপরতা, স্বার্থপরার্থ-পরতা, নিঃস্বার্থতা ও স্বার্থপরার্থের একার্থতা এই চারিটী অবস্থা প্রত্যেক উন্নতিশীল জীবনে লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোল্লিখিত একাগ্রতার চারিটী অবস্থাও প্রত্যেক উন্নতিশীল জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন দুঃখ, সুখ, দুঃখাভাবে দুঃখ ও সুখ দুঃখের মিশ্রণ বা সুখ দুঃখের একত্ব এই চারিটি অবস্থা ক্রমানুসারে ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ একাগ্রতার চারিটী অবস্থাও যথাক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী (খ). তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই চারি মহাভূতময় দেহ ক্রমশঃ ধারণীয়, তদ্রূপ একাগ্রতার চারিটী অংশও ক্রমশঃ ধারণীয়। যেমন তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই তিনটী গুণে সগুণ অবস্থা ও তৎপরে নির্গুণ অবস্থা এই অবস্থা চতুষ্টয় প্রতি-আত্মাকেই ভোগ করিতে হয় বা হইবে, তদ্রূপ একাগ্রতার অংশ চতুষ্টয়ও প্রতি আত্মাকেই যে ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একাগ্রতার উৎপত্তির ব্যাঘাত কি?

যে যে গুণে একাগ্রতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে (পরে দেখ), তৎসমুদায়ের ব্যাঘাত হইলেই একাগ্রতার উৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে। এতদ্ভিন্ন, পার্থিব বিষয়ে অতিলিপ্ততা, এবং লজ্জা, ভয়, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক সঙ্কোচ-ময় ভাবদ্বারাও একাগ্রতার উৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে।

একাগ্রতা কিরূপে অনুভূত হয়?

প্রেম প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে যে, বিরহ ব্যতীত প্রেমের অনুভব

(খ) পৃথিবী অর্থাৎ স্থূলদেহধারীর বাসস্থান বলাতে স্থল ও জল উভয়ই বুঝা-ইতেছে। একারণ কোনও কোনও পণ্ডিত প্রথমে চারিভূত স্বীকার করিয়া, পশ্চাৎ পৃথিবীকে স্থল ও জল এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত বলিয়াছেন।

হয় না। এইটী যাবতীয় কোমল গুণ সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম বটে, কিন্তু ইহা তেজোময় গুণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কি কোমল, কি তেজোময় যাবতীয় গুণ সম্বন্ধে অপর একটী সাধারণ নিয়ম আছে, তদনুসারেই একাগ্রতা অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ নিয়মটী নিম্নে লিখিত হইল।

কি সূর্য্য কিরণ, কি দীপাদির আলোক, যে কোন আলোকের বিষয়েই বিবেচনা কর না কেন, দেখিতে পাইবে যে, উহা প্রস্তর মৃত্তিকাদি কোন পদার্থে যাবৎ সংলগ্ন না হইবে, তাবৎ অনুভূত হইবে না। এ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য অধিক আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকে স্ব স্ব গৃহে বসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, ইহার সপ্রমাণতা অনুভব করিতে পারিবেন। * আধ্যাত্মিক গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কোন একটী আধ্যাত্মিক গুণ কোন একটী সীমা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ উহার সত্তা অনুভূত হয় না এবং সীমাপ্রাপ্ত হইলে সহজেই অনুভূত হয়। একাগ্রতাও একটী আধ্যাত্মিক গুণ, সুতরাং ইহার অনুভবও কোন একটী সীমা প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। যাবৎ মনুষ্য বিক্ষিপ্ত-চিত্ততা হইতে এক-নিবিষ্টতা প্রাপ্ত না হয়, যাবৎ এক-নিবিষ্টতা হইতে এক-লক্ষ্য-

---

* পরীক্ষা এইরূপে করা যাইতে পারে ; যথা—কোন একটী গৃহের মধ্যে একটী প্রদীপ এরূপ ভাবে প্রজ্বলিত করিয়া স্থাপন কর যে, উহার সম্মুখ ভাগ গৃহের সম্মুখ ভাগের দিকে থাকে। অনন্তর, ঐ গৃহের অন্যান্য সমস্ত কপাট ও জানালা বন্ধ করিয়া কেবল দীপ সম্মুখীন দ্বার খুলিয়া রাখিয়া, বাহিরে আসিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে যাবৎ ঐ দীপ নিঃসৃত আলোক অবলম্ব্য তরুলতা মৃত্তিকাদি পদার্থ না পাইতেছে, তাবৎ উহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না। কিন্তু, যে যে স্থানে উহার সত্তা অনুভূত হইতেছে না, তথায়ও যে উহা আছে, তাহা, সেই সেই স্থানে পূর্ব্বোক্ত কোন অবলম্ব্য বস্তু রাখিলে বা স্বয়ং গমন করিলে অনুভব করা যায়।

প্রধানতা লাভ না করে এবং যে পর্য্যন্ত একলক্ষ্যপ্রধানতা হইতে পূর্ণ একাগ্রতা প্রাপ্ত হইতে না পারে, তাবৎ একাগ্রতার অনুভব হয় না ; অর্থাৎ এক একটী সীমা পাইলেই একাগ্রতাও সীমানুরূপ অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপেই একাগ্রতা অনুভূত হয়।

একাগ্রতার সাধনা।

একাগ্রতার প্রথম অংশ যখন মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক অর্থাৎ উহা যখন সর্ব্ব ভূমণ্ডলের নিখিল আত্মাতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তখন উহার জন্য আর কোন সাধনা করিতে হয় না। কিন্তু একাগ্রতার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অংশ অর্থাৎ এক নিবিষ্টতা প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য সাধনা আবশ্যক।

যখন দেখিতে পাই যে, একটী বস্তুর জ্ঞান না হইলে তজ্জাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, যখন দেখিতে পাই যে একপোয়া আহার-করা অভ্যস্ত না হইলে ৫ পাঁচপোয়া উদরস্থ করিবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয় এবং যখন দেখিতে পাই যে, পুষ্পাদি একটী পদার্থ সংগ্রহ না হইলে বহু পদার্থ কখনই সংগৃহীত হইতে পারে না, তখন যে একাগ্রতাও একের প্রতি সাধনা ব্যতীত কখনই বর্দ্ধিত হইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বস্তুতঃও একনিবিষ্টতা লাভ না করিয়া একাগ্রতার প্রকৃত উন্নতি করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে একাগ্রতার যে চারিটী বিভাগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪র্থ অবস্থা অতি দুর্লভ, এমন কি, এই স্থূলতম দেহাবচ্ছিন্ন কালে উহা লাভ করা অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষেই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তৃতীয় অবস্থা যথোচিত যত্ন পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাপ্তব্য হইতে পারে এবং উহাই সমস্ত সৎ ও সতীদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ১ম ও ২য় অবস্থা ব্যতীত

৩য় অবস্থা লাভ করা যায় না বটে, এবং ১ম ও ২য় অবস্থা অতিক্রান্ত না হইলে ৩য় অবস্থার উপলব্ধি হইতে পারে না বটে, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৩য় অবস্থা লাভ করিতে ১ম ও ২য় অবস্থার যে টুকু মাত্র সংস্রব রাখা আবশ্যক, তদ্ব্যতীত বা তদধিক সংস্রব রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। মনে কর, কোন এক ব্যক্তিকে ত্রিতল (তেতালা) গৃহে যাইতে হইবে। এক্ষণে তিনি যদি এক তালার প্রত্যেক অন্ধকারময় গৃহের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া, পশ্চাৎ দ্বিতলের বিষয়েও ঐরূপে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার দৈহিক কালের মধ্যে হয় ত ত্রিতলে গমনই হইয়া উঠিবে না। কিন্তু তাঁহার যদি যথা সর্ব্বস্ব ত্রিতলে স্থাপিত থাকে, তবে যাহা না হইলে নয়, এইরূপে ভ্রমণ পূর্ব্বক একতল ও দ্বিতল অতিক্রম করিয়া, ত্রিতলে গমন পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হওয়া যেমন তাঁহার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ একাগ্রতার বিষয়েও জানিবে। অর্থাৎ একাগ্রতার ২য় অংশের যে টুকু না হইলে নয়, তাহা মাত্র সাধনা করিয়া ৩য় অংশের সাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, যেরূপ আহারার্থী ব্যক্তি, তণ্ডুল পাক করিবার জন্য ক্রমাগত কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা স্থালী (হাড়ী) সংগ্রহ করিতে থাকিলে, তদীয় উদ্দেশ্য ভোজন ক্রিয়া অসম্পাদিত থাকে এবং পরিশ্রম জনিত দেহ ক্ষয়ের পূরণ না হওয়াতে অকালে কালগ্রাসে পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তদ্রূপ প্রকৃত কার্য্যোপযোগিনী উল্লিখিত তৃতীয় অবস্থার উপাদান ভূত ২য় অবস্থায় অতিমাত্র লিপ্ত হইলেও প্রকৃত ফলে বঞ্চিত হইতে যে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একাগ্রতার সাধনাকারী কিঞ্চিৎ অভিনিবিষ্ট হইলেই জানিতে পারিবেন যে, একাগ্রতার প্রথম অংশ মনুষ্যের স্বাভাবিক ও ২য় অংশ কেবল ৩য় অংশ লাভার্থেই আবশ্যক, নতুবা উহার অতিরিক্ত সাধনা (পার্থিব ভাবে) করিতে হইলে অসার জড়পিণ্ডবৎ হইয়া যাইতে হয়। এইরূপ করিলে ব্যায়াম বিদ্যায় সবিশেষ নিপুণগণের ন্যায় কার্য্য-

বিশেষ দ্বারা বাহ্য জগৎকে বিস্মিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু উহাতে আধ্যাত্মিক জগৎ একেবারে অস্পৃষ্ট থাকে। আমরা স্বীকার করি যে, জড় সমাধি প্রার্থী যোগিগণ ঐরূপ চেষ্টা করিয়া যদি বহু বর্ষান্তে কৃতকার্য্য হন তবে তাঁহারা ঐরূপ করিতে পারেন, কিন্তু উহাতে দেহের উন্নতি ভিন্ন আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা, সাধনার সময়ের সহিত তুলনায় যে সামান্য লাভ হয়, তাহা লাভ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ এই প্রবন্ধের—"শাস্ত্রে একাগ্রতার বিষয়ে কি আছে ?" এই অংশে সন্নিবেশিত হইবে।

আপাততঃ, প্রতীয়মান হয় যে, একাগ্রতার সাধনা অংশে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যক। যথা—

(১) কিরূপ সাধনা দ্বারা ১ম অবস্থা হইতে ২য় অবস্থায়,

(২) ২য় অবস্থা হইতে ৩য় অবস্থায় এবং

৩) ৩য় অবস্থা হইতে ৪র্থ অবস্থায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে ?

কিন্তু, এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আধ্যাত্মিক নিয়মে কোন একটী গুণের প্রথম উন্নতির জন্য যে সকল সাধনা করা আবশ্যক, অধিকতর উন্নতির জন্যও প্রায় তদ্রূপ সাধনাই প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়, (কোন কোন গুণের বিষয়ে যে অন্যবিধ সাধনারও উল্লেখ আছে, তাহাও গৌণ কল্প মাত্র, মুখ্যকল্প নহে), যৎকিঞ্চিৎ যে প্রভেদ, তাহা পুস্তকে লিখিয়া শেষ করা যায় না অথবা প্রকাশিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা উপযুক্ত নহে। প্রত্যেক সৎসতীর কর্ত্তব্য যে, সাধনা কালে কোন মহাত্মার নিকট হইতে উহা পরিজ্ঞাত হন। লিখিয়া শেষ করা না যাওয়ার কারণ এই যে, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা ভেদে এবং মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিয়মে প্রাপ্স্যমান জীবনস্রোতো বিশেষ ভেদে প্রত্যেকের পক্ষেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সাধনা আবশ্যক। ইহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া পরিত্যক্ত

হইল। কৌতূহলী পাঠক সাধনা নামক বৃহদায়তন গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন, ইহাই প্রার্থনা।

কি কি উপায়ে একাগ্রতার বৃদ্ধি হয় ?

(১) যখন দেখিতে পাই যে, আমরা যে বস্তুকে বা যে ব্যক্তিকে যত অধিক পরিমাণে ভালবাসি, অনন্যাসক্ত হইয়া সেই বস্তু বা সেই ব্যক্তিতে তত অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারি এবং যাহা ভাল বাসিনা, তাহাতে অল্পক্ষণ মাত্র মনোনিবেশ করিয়াই সাতিশয় ক্লান্তিবোধ করি ও চঞ্চলচিত্ত হই, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি কোমলগুণ সমূহের সাধনা দ্বারাই একাগ্রতা-গুণের উন্নতি হয়। বস্তুতঃও প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি গুণদ্বারা যেমন একাগ্রতার বৃদ্ধি হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

(২) সত্যধর্ম্মের মূল পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, গুণানুশীলনই গুণবৃদ্ধির উপায়। যখন নিখিলগুণের উন্নতির পক্ষে অনুশীলন প্রশস্ত উপায়, তখন যে উহা একাগ্রতার পক্ষেও কার্য্যকারী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বস্তুতঃও একাগ্রতার অনুশীলন করিলে অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে মন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভীষ্ট বস্তুতে পুনঃ পুনঃ স্থাপন করিলে একাগ্রতার বৃদ্ধি হয়।

(৩) বুভুৎসা বৃত্তি বলবতী হইলেও একাগ্রতাবৃদ্ধি হয়। বুভুৎসা অর্থাৎ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা যখন প্রবল হয়, তখন ২য় উপায়ে অজ্ঞাতসারে অতিদৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ কার্য্যসাধন হওয়াতেই একাগ্রতার বৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

(৪) জ্ঞানাদি তেজোময় গুণের বর্দ্ধিতাবস্থায়ও একাগ্রতার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কোমলগুণের সাধনায় যেমন প্রথমে ও সহজে হয়, তেজোময় গুণের বিষয়ে তদ্রূপ নহে। উহাদিগের বর্দ্ধিত অবস্থায়ই কেবল একাগ্রতার

বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কারণ একাগ্রতা স্বয়ংই যখন তেজোময় গুণ, তখন তেজোময় অপরগুণে অর্থাৎ স্বজাতীয় গুণদ্বারা যে উহার প্রথমাবস্থায় উন্নতি হইতে পারে না, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। দেখ, প্রথমে পুরুষের পক্ষে পুরুষের সহিত প্রেম বা প্রণয় সাধনা করা যেরূপ দুরূহ, রমণীর সহিত প্রেম সাধনা করা তাদৃশ দুরূহ নহে। এইরূপ বাহ্যজগতে দেখিতে গেলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না দুইটী পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে উহাদিগের রাসায়নিক সংযোগ যেমন হইতে পারে, এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে কখনই তদ্রূপ হইতে পারে না। এবিষয়ের বিবরণ রসায়ন শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বিবৃত আছে, কৌতূহলী পাঠক উহা পাঠ করিলেই সবিশেষ বিদিত হইতে পারিবেন।

উপরিভাগে যাহা যাহা লিখিত হইল, তৎসমুদায় পাঠ করিলে প্রতীতি হইতে পারে যে, স্বজাতীয় গুণদ্বারা কোনও গুণের বৃদ্ধি হওয়া কঠিন। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, বাহ্যজগতে যেমন এক ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ দ্বয়ের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া কখনই সুচারুরূপে হইতে পারে না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধেও প্রথমে হইতে পারে না বটে, কিন্তু উন্নতাবস্থায় হইতে পারে। আধ্যাত্মিক জগৎ বাহ্যজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্ববিষয়েই ইহার বিশেষত্ব আছে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ "বাহ্যজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ" নামক প্রবন্ধে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

একাগ্রতাবৃদ্ধির এই অংশে পরিশেষে বক্তব্য এই যে, একাগ্রতা যখন নিখিল গুণরাশির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বা ব্যাপ্য-ব্যাপক রূপে সংযুক্ত রহিয়াছে, তখন যে কোন গুণেরই সাধনা কর না কেন, তাহাতেই যে প্রারম্ভে বা শেষে, অধিক বা অল্প পরিমাণে একাগ্রতারও বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৫) উপাসনা ও প্রার্থনাদ্বারা যেমন অন্য সকল গুণই অধিক বা অল্প পরিমাণে লব্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ একাগ্রতা বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। প্রার্থনা যে কি মধুময় অমৃতময় পদার্থ, তাহা বর্ণনা করিয়া অপরের হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। যেমন যে সন্দেশ না খাইয়াছে, সন্দেশ যে কি সুমিষ্ট ও সুস্বাদ পদার্থ, তাহা বর্ণনা করিয়া সম্যক প্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় বোধগম্য করা যায় না, তদ্রূপ প্রার্থনার বিষয়েও জ্ঞাতব্য। বিশেষতঃ, আধ্যাত্মিক জগতের ইহাই এক সবিশেষ চমৎকারিত্ব যে, যাহা সহস্র কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে কার্য্য সম্পাদন বা সাধনা দ্বারা জানা যাইতে বা অনুভব করিতে পারা যায়। ঐ যে সম্মুখে একটী সিন্ধুক দেখিতেছ, উহার অভ্যন্তরে যে কি অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যাদি আছে, তাহা বহির্দ্দেশ হইতে সহস্র তর্কবিতর্কদ্বারাও জানা যায় না বটে, কিন্তু ঐ সিন্ধুকের অধিকারীর নিকট হইতে চাবিটী আনিয়া খুলিয়া দেখিলে সহজেই জানিতে পারা যায়। এইরূপ প্রার্থনার ফল তর্কের দ্বারা জানিতে চেষ্টা না করিয়া, প্রাণের সহিত একবার প্রার্থনা করিলেই জানা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, যেমন কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্ধুকের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা ও কাষ্ঠের বেধ জানা থাকিলে এবং উহার বহির্ভাগে পিত্তলাদি যাহা যাহা আছে, তৎসমুদায়েরও উক্তরূপ পরিমাণ জানা থাকিলে শূন্য সিন্ধুকের প্রকৃত ওজন স্থির করিয়া দ্রব্য পূর্ণ সিন্ধুকের ওজন জানিয়া ও উল্লিখিত পরিমাণ স্থানে কীদৃশ আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পন্ন বস্তু থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া উহার মধ্যস্থ পদার্থেরও জ্ঞানলাভ করা যায়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহেরও কার্য্য কারণ ভাব জানা যাইতে পারে, কিন্তু সামান্য সিন্ধুক সংক্রান্ত জ্ঞানলাভার্থে যেমন বাহ্য জগতের বহুতর জ্ঞান অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম প্রবেশকালীন কার্য্য নিচয়ের কারণ জ্ঞানও বহুতর উন্নতিলাভ সাপেক্ষ।

বাহ্যজগতে সিন্ধুকাভ্যন্তরস্থ পদার্থের জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে যেমন উহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থের জ্ঞানলাভার্থে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায় অন্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক জগতে তাহা হয় না। এ কারণই আধ্যাত্মিক জগতের অনেক কার্য্য, কারণ বোধ না হইলেও কেবল গুরুদেবের বাক্যানুসারে সম্পাদন করিতে হয়। প্রার্থনা বিষয়েও তদ্রূপ। যে সকল মহাত্মারা প্রার্থনা করিয়া চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাক্যানুসারেই আমরাও প্রথমে উহার কর্ত্তব্যতা ও ফল দায়কতা বিশ্বাস করি, এবং ঐ বিশ্বাস সহকারে কিছুদিন কার্য্য করিলেই উহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারি।

বিশেষতঃ, যে অনন্ত শক্তি আমাদিগের প্রার্থনার পূর্ব্বেই আমাদিগের আশু প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ প্রদান করিয়াছেন ; প্রাণের সহিত প্রার্থনা করিলে তিনি যে সকলই প্রদান করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ???

(৬) মহাত্মাদিগের করুণায় প্রাপ্ত বীজবিশেষ উচ্চারণদ্বারাও একাগ্রতা বৃদ্ধি হইতে পারে।

বীজবিশেষ উচ্চারণ দ্বারা একাগ্রতা কেন সমস্ত গুণই লাভ করিতে পারা যায়। ভক্তি সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বীজবিশেষ উচ্চারণ দ্বারা ভক্তি গুণ লাভ করা যায়। এইরূপ অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য। ইহার কারণ নিম্নে লিখিত হইল।

এমন অনেক ব্যারাম আছে, উহা শরীরের কোন্ অংশে যে জন্মিয়াছে, তাহা পার্থিব জ্ঞানে নির্ণয় করা যায় না, অথচ এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব যাতনা বোধ হয়। তত্তৎকালে ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে, কোন কোন ব্যক্তির মস্তকে, কাহারও ভ্রূদেশে, কাহারও গলদেশে, কাহারও বা বক্ষঃস্থলে, কোনও ব্যক্তির বা নাভিদেশে এবং কাহারও বা অন্য স্থানে হস্ত পরামর্শ করিলে (হাত বুলাইয়া দিলে) ঐ যাতনার উপশম বোধ হয়।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থানে কোনও বিকৃতি জন্মিয়াছে। কিন্তু বেদনাদি যদি ঐ সকল স্থানে হইত, তবে ত তাহা সহজেই জানা যাইতে পারিত, সুতরাং অন্য এ রূপ কোন বিকৃতি হইয়াছে বা হইতেছে যে, তাহা পার্থিবভাবে জানা যাইতে পারে না। সেই পীড়া কি ? এবং কি জন্যই বা ঐ স্থানে হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তাহার উপশম বোধ হইল, তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

ঐ পীড়াটী ঐ সকল স্থানে যে সকল বীজ আছে, তাহাদিগের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের উপক্রম। আর ঐ সকল স্থানে হাত বুলান যদি এরূপ ভাবে হয় যে, তাহাতে ঐ বীজের অনুকূলতা সাধন হইতে পারে, তবেই উহাতে উপশম বোধ হয়।

এই বিষয়টী পরিস্ফুটরূপে বুঝাইতে গেলে ষট্‌চক্র বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ জানা আবশ্যক, কিন্তু এ স্থানে তাহা বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত করা উচিত নহে। এজন্য সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

পার্থিব আত্মাদিগের শিরোমণি মহাত্মা মহাদেব ষট্‌চক্র বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মেরুদণ্ডের দুইদিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী আছে। ঐ ইড়ার দক্ষিণে ও পিঙ্গলার বামভাগে সুষম্না নাড়ী আছে। ঐ সুষম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও তাহার মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিতি করে। দেহ মধ্যে ৭টী স্থানে ৭টী পদ্ম সুষম্নায় গ্রথিত আছে। যথা,—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল। মূলাধার বা আধারপদ্ম পায়ুদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ভাগে, স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গমূলে, মণিপূর নাভিমূলে, অনাহত হৃদয়ে, বিশুদ্ধপদ্ম কণ্ঠদেশে, আজ্ঞাপদ্ম ভ্রূমধ্যে এবং সর্ব্বোপরি মস্তকে সহস্রদল পদ্ম বিদ্যমান আছে। এই সকল স্থানে যে সকল বীজ আছে, তাহা উপাসনা গ্রন্থে দেখ।

ঐ সকল বীজগুলি বস্তুতঃ বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত নহে। উহারা বৈজিক ভাষার বর্ণমালা অনুসারে লিখিত। বৈজিক বর্ণমালা সাধারণ্যে প্রচারের অদ্যাপি অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না।

ঐ গুলি বস্তুতঃ পদ্ম নহে, পদ্ম বলিয়া রূপক করা হইয়াছে মাত্র। শরীরাভ্যন্তরস্থ নাড়ীবিশেষের সংযোগে ঐ গুলি উৎপন্ন। সুতরাং কোন কোনও পদ্ম লোহিত দলবিশিষ্ট, কেননা সে গুলি ধমনীর, কৈশিকার অথবা ফুস্‌ফুসীয় শিরার সংযোগে গঠিত; কোন কোনওটী কৃষ্ণদল বিশিষ্ট, কেননা সে গুলি শিরা সংযোগে বা ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দ্বারা নির্ম্মিত; কোন কোনওটীর কতিপয় দল কৃষ্ণবর্ণ ও কয়েকটী লোহিত বর্ণ, কেননা সে গুলি শিরা ও ধমনী উভয়ের সংযোগে রচিত এবং কোন কোনওগুলি শুভ্রবর্ণ, কেননা সে সকল, স্নায়ুযোগে বিরচিত। আর কোন কোনওটী মিশ্রবর্ণ দলশোভিত, কেননা সে সকল পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য নাড়ীসমূহ সংযোগে উৎপন্ন।

উল্লিখিত ৭টী পদ্মে যে সকল দলের সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সমস্তও বৈজিকবর্ণ মালার আকার অনুসারেই হইয়াছে। নতুবা চিত্রে যেরূপ আকার থাকে, ঐরূপ উহাদিগের আকৃতি নহে। প্রকৃত আকৃতি কি? তাহা বৈজিক বর্ণমালায় জ্ঞানলাভ করিলেই সৎ ও সতীরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

নাড়ী সংযোগোৎপন্ন উল্লিখিত আকৃতির সংখ্যা ৬৮টীর অধিক হইলেও তন্মধ্যে ৫০টী প্রধান। এজন্য আর্য্যেরা বর্ণসংখ্যাও পঞ্চাশৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং এজন্যই 'ক্ষ' সংযুক্ত বর্ণ হইলেও উহাকে মূল বর্ণ মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ঐ আকৃতি গুলিই বৈজিক ভাষার বর্ণের আকার।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি উল্লিখিত বীজ সমূহের মধ্যে কোনও বীজের কোনও পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হয়, তবে পীড়া হইবার সম্ভাবনা কি না এবং পুনরায় পূর্ব্বাকারে স্থাপিত হইলে উহা আরাম হয় কি না? যদি হয়, তবে এক্ষণে দেখ, 'মা' বলিলেই বা ভক্তিভাব অধিক হয় কেন এবং মাতা বলিলেই বা তত হয় না কেন? 'মা' এইটী ওষ্ঠ্য ও কণ্ঠ্য বর্ণ, কিন্তু 'মাতা' এই পদে ওষ্ঠ্য ও কণ্ঠ্য ভিন্ন দন্ত্য বর্ণও আছে, সুতরাং 'মা' উচ্চারণের পরে যে ভক্তি-স্রোত ঊর্দ্ধদিকে যাইতেছিল, 'তা' উচ্চারণে তাহা নিম্নস্থ হইল, সুতরাং ভক্তির আধিক্য হইতে পারিল না। আবার ব্যাকরণ শাস্ত্রে বর্ণের যে সকল উচ্চারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সংযোগাবস্থায় তদ্ব্যতীতও উহাদিগের উচ্চারণ স্থান আছে। এসকল বিষয়ের যথাযথ বিবরণ অতি গুহ্য ও বিস্তৃত, এজন্য এস্থলে লিখিত হইল না। প্রচলিত সর্ব্বভাষাশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষায় এ বিষয়ের কিছু কিছু অংশমাত্র আছে, যথা—

শিক্ষাশাস্ত্রে—

হকারং পঞ্চমৈর্যুক্তম্
অন্তস্থাভিশ্চ সংযুতং।
ঔরস্যং তং বিজানীয়াৎ
কণ্ঠ্য মাহু রসংযুতং॥

অর্থাৎ

হকার পঞ্চমবর্ণ বা অন্তস্থাবর্ণ সংযুক্ত হইলে বক্ষঃপ্রদেশ হইতে উচ্চারিত হয়। আর অসংযুক্ত হকার কণ্ঠদেশ হইতে উচ্চারিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তৎপাঠে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, উচ্চার্য্যমাণ বর্ণাবলীর সহিত আমাদিগের হৃদয় ভাবের বা গুণের

অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ তাহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, এজন্য ঐটী অন্যরূপে আবার স্পষ্টতর করা যাইতেছে।

মনে কর, আমি কোন বৃক্ষাদিশূন্য নির্জন স্থানে উপবিষ্ট আছি। এ সময়ে আমার নিকট এরূপ কোন ঘটনা হইতেছে না যে, তাহা দর্শন করিয়া আমার মনে বীর বা করুণাদি রসের উদয় হইবে। এমত সময়ে যদি আমি কোন বীররসাত্মক কাব্য পাঠ করি, তবে আমার মনে বীররসের উদয় হয় কি না? এবং যদি করুণরসাত্মক কাব্য পাঠ করি, তবে আমার হৃদয় আর্দ্র হয় কি না? যদি বল গ্রন্থার্থ মনোমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক নায়ক নায়িকাদির কল্পনাদ্বারা ঐরূপ হয়, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, শব্দ শক্তি দ্বারা ওরূপ হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি আমি তৎকালে কোনও গ্রন্থ স্বয়ং পাঠ না করি, কিন্তু দূর হইতে বীররসাত্মক কোন কাব্য বা করুণ রসাত্মক কোনও গ্রন্থ শ্রবণ করি, অথচ উহা অপরিজ্ঞাত ভাষায় উচ্চারিত বলিয়া অর্থ বোধ করিতে না পারি, তথাপি যখন আমার হৃদয়ে বীরভাবের বা করুণরসের উদয় হয়, তখন শব্দ শক্তি যে, গুণের বর্দ্ধক ও হ্রাসক তাহা অবশ্যই মানিতে হইবে। আরও দেখ, ঐ কারণ বশতঃ অপরিস্ফুট স্বরে কেহ কাঁদিলেও আমাদিগের কান্না আইসে। ঐ স্থানে যদিও শব্দার্থ জ্ঞান হয় না বটে, কিন্তু শব্দশক্তি প্রভাবে করুণরস উদ্দীপিত হয়। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, শব্দবিশেষ উচ্চারণ দ্বারা গুণবিশেষ বর্দ্ধিত হয়।

অপিচ, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাহারও রচিত করুণরসাত্মক কাব্য পাঠে হৃদয়ে করুণরসের অল্প উদয় এবং কাহারও রচিত গ্রন্থ পাঠে অধিকতর আবির্ভাব হয়, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, এতাদৃশ রচনা অবশ্যই থাকিতে পারে, যাহা পাঠে করুণরসের তৎকালোপযুক্ত সম্পূর্ণ উদয় হইবে।

প্রচলিত পার্থিব ভাষা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মধ্যে কোনও একটী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কেননা উহাদিগের মধ্যে কোনটীই সম্পূর্ণ নহে। দেখ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, আরবী, পার্শী, গ্রীক, লাটিন. হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় উচ্চার্যমাণ বর্ণাবলীরই যখন অভাব আছে, তখন ঐ সকল ভাষা উচ্চারণ দ্বারা উল্লিখিত মনোরথ সিদ্ধিরও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। তবে প্রচলিত ভাষাসমূহেরমধ্যে যে ভাষার যে অংশ পূর্ণভাষা বৈজিক ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহাতেই উল্লিখিত অভিপ্রায় অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হয়। কিন্তু বৈজিক ভাষা উচ্চারণে যেরূপ সম্পূর্ণ হয়, অন্য কোনও ভাষায় তদ্রূপ হয় না। কেননা বৈজিক ভাষাই পূর্ণ ভাষা, বৈজিক ভাষাই নিখিল ভাষার মাতা ও পিতা, বৈজিক ভাষাই সমস্ত ভাষার উৎকর্ষ বিধানের মূল এবং বৈজিক ভাষাই সার্ব্বভৌম সার্ব্বজীবিক ভাষা। একারণ উন্নত মহাত্মারা এই অতি মহীয়সী ভাষায় যে সকল বীজ (বৈজিক ভাষায় লিখিত বাক্য) প্রদান করেন, তাহার উচ্চারণেই অভিপ্রেত সিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে হইয়া থাকে। এবং এই কারণ বশতঃই বীজ বিশেষ উচ্চারণে ভক্তি প্রভৃতির ন্যায় একাগ্রতা বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। এ বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ ষট্‌চক্র নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

উপরিভাগে যাহা যাহা লিখিত হইল, তৎসমুদয় পাঠে সাধারণে ইহাও জানিতে পারিলেন যে, যে সকল ভাষা জগতে সাধারণ ভাবে প্রচারিত আছে, তদ্ব্যতীত বৈজিক ভাষা নামে অপর একটী ভাষাও আছে। ঐ ভাষার সত্তার প্রমাণ পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতেও জানা যাইতে পারে বটে, তথাপি সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে নিম্নে আরও বিশেষ করিয়া লিখিত হইল। কেননা এই একটী নূতন ও অতি প্রয়োজনীয় কথা, ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক মাত্র অনাদি অনন্ত অসীম-শক্তি-সম্পন্ন পরম পিতা পরমেশ্বর হইতে সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি ঐ সৃষ্টি অপ্রণালী বদ্ধ-রূপে করেন নাই অর্থাৎ হঠাৎ ইচ্ছা হইল, অমনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, এরূপ নহে। সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত ব্যাপার, সমস্ত ঘটনা, ক্রমভাবে পূর্ণ, ক্রমই তাঁহার সৃষ্টির প্রধান নিয়ম, ক্রমই তাঁহার পালনের মূল রীতি এবং ক্রমই লয়ের মূল প্রণালী, অর্থাৎ কি সৃষ্টি, কি স্থিতি, কি লয়, সমস্তই ক্রমানুসারে হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে।

হে প্রিয়তম ধর্ম্মার্থিন্! এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অনাদি অনন্ত অসীম গুণ সম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন, ইহা তুমি অবগত আছ। তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় ইচ্ছা শক্তিকে প্রকৃতি করিলেন। ঐ ইচ্ছা শক্তি হইতে কতক গুলি এরূপ পদার্থ সৃষ্টি হইল যে, তাহারাও আবার এক এক বিষয়ের প্রকৃতি হইল। কিন্তু আত্মার সৃষ্টির জন্য (অনন্তের অংশ জীবাত্ম-রূপে পাশবদ্ধাবস্থায় পরিণত কারবার নিমিত্ত) ঐ মূলশক্তি ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি রহিলেন। ঐ আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতি হইতে ভূত সৃষ্টির জন্য আকাশ বা ব্যোম সৃষ্টি হইল, এবং ক্রমানুসারে ঐ মূলভূত হইতে বায়ু অগ্নি, পৃথিবী (জল ও স্থল) উৎপন্ন হইল। আবার নিখিল মণ্ডল সৃষ্টির নিমিত্ত অগ্ন্যাত্মক সূর্য্য মণ্ডল প্রকৃতিরূপে সৃষ্ট হইল, এবং ক্রমানুসারে উহা হইতে অন্যান্য মণ্ডল সৃষ্ট হইবার পরে পৃথিবী সৃষ্টি হইল। ইত্যাদি।

ঐ পরম পুরুষ এই সকল প্রকৃতি হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, একারণ দ্বিতীয় প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া এতদ্দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থে ব্রহ্মার কন্যাগমন নামক রূপক প্রবন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, এবিষয়ের বিবরণ নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, পুরাণাদি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিষয় এস্থলে বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যেমন একই অনাদি অনন্ত পরম পুরুষ যোগে ইচ্ছা শক্তি হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন ঐ পরম পুরুষ যোগে একই ব্যোম পদার্থ হইতে নিখিল ভূত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যেমন ঐ অনন্তশক্তি সম্পন্ন পরম পুরুষ যোগে সূর্য্য হইতে সমস্ত মণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত মণ্ডলের নিখিল জীবের নিখিল ভাষাও একই মহতী ভাষা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যদি ইহা স্বীকার না কর, তবে এই ক্রমপূর্ণ সৃষ্টিতে অক্রমভাব ব্যাপ্তি দোষ উপস্থিত হয়। আরও দেখ, যে জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে, তৎসমস্তই উক্ত জাতীয় পদার্থ হইতে উৎপন্ন। কেননা ভূত সকল মূলভূত আকাশ হইতে এবং মণ্ডল সমূহ সূর্য্য মণ্ডল হইতে উৎপন্ন, ইত্যাদি। অতএব সমস্ত ভাষাও যে কোন একটী মূলভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সর্ব্বমণ্ডলের সর্ব্ব মনুষ্যের সমস্ত জীব জন্তুর যে সাধারণ ভাষা, তাহাই ঐ মূলভাষা। এই সার্ব্বভৌম সার্ব্বজীবিক ভাষাকে বৈজিক ভাষা কহে। যেমন বীজ হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বীজ-ভূত ভাষা হইতে নিখিল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই উহার ঐ নাম হইয়াছে। বৈজিক ভাষায় জ্ঞানলাভ হইলে সমস্ত জীবের সমস্ত ভাষা জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু যেমন একটী ক্ষুদ্র আম্রফল যে সে জীবে খাইতে পারিলেও উহার উৎপাদক বৃহৎ বৃক্ষটী ভক্ষণ করা দৃশ্যমান জগতের কোনও একটী জীবের সাধ্য নহে, তদ্রূপ উৎপন্ন ভাষাসমূহে জ্ঞানলাভ করা যেরূপ সামান্য আয়াস-সাধ্য, উৎপাদিকা ভাষায় তদ্রূপ নহে। ঐ উৎপাদিকা বৈজিক ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আত্মাকে বহুগুণে উন্নত করিতে হয়, তাহা না হইলে কদাচ তাহাতে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মহীয়সী ভাষা পূর্ণ ও অশেষগুণ সম্পন্ন বলিয়া মহাত্মা ভোলানাথ এই ভাষায় দীক্ষাদান

প্রণালী ভূমণ্ডলে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সত্যধর্ম্মাবলম্বী গুরুগণ, ঐ কারণে বৈজিক ভাষায় দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

(৭) সপ্তমং নৈব দৃশ্যতে অর্থাৎ একাগ্রতার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্য উপায় দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে পরমেশ্বরের করুণাই সপ্তম সাধন। যাহা হউক, ২য় অবস্থা হইতে ৩য় অবস্থায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধিসাধন সহায় গুণ গুলির সবিশেষ উন্নতি হওয়া আবশ্যক, এইমাত্র প্রভেদ। যেমন প্রেমের পরাকাষ্ঠা হইতে অভেদজ্ঞান, অভেদের পরা-কাষ্ঠা হইতে সোহং জ্ঞান এবং সোহং জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় অভিধান নামক অতি দুর্লভগুণ মূর্ত্তিমান হইয়া সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ একাগ্রতার উক্ত চতুর্ব্বিধ অবস্থাও সাহায্যকারী গুণনিচয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ উন্নতি দ্বারা হইয়া থাকে।

অপর, তৃতীয় অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থায় যাইতে হইলে যে যে সাধনা আবশ্যক, তৎ-সমুদায় অতিগুহ্য, একারণ এস্থলে লিখিত হইল না। প্রত্যেক সৎসতী স্ব স্ব গুরুর বা অন্য কোন মহাত্মার নিকটে জ্ঞাত হইবেন।

যেমন প্রেম সাধনা করিতে হইলে পুরুষের পক্ষে প্রথমে একটী রমণীর প্রতি এবং রমণীর পক্ষে প্রথমে একটী পুরুষের প্রতি প্রেম করিয়া প্রেমের অন্তিম সীমায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক (১); যেমন ভক্তি

---

(১) প্রথমে স্ত্রী, পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি প্রেম না করিয়া যদি স্বজাতির প্রতি প্রেম বা প্রণয় করে, তবে প্রেম পূর্ণ হইতে পারে না, ও তাদৃশ সুখকরও হয় না। কারণ প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় আত্মার প্রতি আত্ম-প্রেমগুণে প্রেম করে বলিয়া স্বজাতীয়ের প্রতি প্রেম অভিনব সুখ-প্রদ হয় না ও অন্য জাতীয়ের প্রতি প্রেমের যে মাধুর্য্য, তাহাও বোধ করিতে পারে না এবং দ্বিবিধ প্রেম জনিত সুখ একটী পাত্র অবলম্বনে ঘটে না। একারণই প্রথমে ভিন্ন জাতীয়ের প্রতি প্রেম করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

সাধনা (২) করিতে হইলে প্রথমে মাতাপিতার প্রতি (বিশেষতঃ কন্যা সন্তানের পক্ষে পিতার প্রতি ও পুত্র সন্তানের পক্ষে মাতার প্রতি) ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; যেমন শ্রদ্ধা সাধনা করিতে হইলে প্রথমে একটী গ্রাম্য পশুর প্রতি শ্রদ্ধাকরা কর্ত্তব্য ; যেমন বিশ্বাস সাধনা করিতে হইলে, প্রথমে কোন একজন মনুষ্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বিধেয় ; যেমন নির্ভরতা সাধনা করিতে হইলে প্রথমে কোন এক মহাত্মাকে সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন ও তিনি যাহা করেন, তাহাই আমার মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকেন বলিয়া নির্ভর করা অর্থাৎ তাঁহার প্রতি ভারার্পণ করা আবশ্যক এবং এইরূপ যে কোন গুণ সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হওনা কেন, একটীর প্রতি উহার সাধন না হইলে বহুর প্রতি যেমন হইতে পারে না এবং বহুর প্রতি সাধন না হইলে যেমন বহুত্বের বিনাশ ও একত্বের লাভ (৩) হয় না, তদ্রূপ একাগ্রতার পক্ষেও জানিবে। কেন না, একাগ্রতার যে প্রথম অংশ মনুষ্যমাত্রেই বিদ্যমান থাকে, তাহার পরে ২য় অবস্থা (একনিবিষ্টতা) লাভ করা অর্থাৎ কোন একটীর প্রতি একাগ্র হওয়া উচিত। এই একটী স্ত্রী বা স্বামী, মাতা বা পিতা, মহাত্মা গুরুদেব বা অন্য কোন মহাত্মা অথবা স্নেহাস্পদ পুত্র বা কন্যা ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোনটী হওয়া আবশ্যক। অনন্তর ঐ একটীর প্রতি একটী গুণে একাগ্রতা হইলে, ঐ

---

(২) ভক্তি প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাব, সুতরাং আধ্যাত্মিক নিয়মে কন্যা সন্তানের পিতার প্রতি ও পুত্র সন্তানের মাতার প্রতি যে প্রথমে ভক্তি সঞ্চার সহজে হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? কেন না, প্রেম বিষয়ে যে যে কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ভক্তি বিষয়েও তাহাই বিবেচ্য। দেখ পুরুষেরা 'মা' এই শব্দ যখন উচ্চারণ করে, তখন তাহাদিগের কিরূপ ভক্তির অবস্থা হয়, কিন্তু যখন 'বাবা' বলে, তখন কি তদ্রূপ হয় ? কখনই নহে। এইরূপে স্ত্রীলোকের পক্ষেও হইয়া থাকে।

(৩) একত্ব যে কি তাহার বিশেষ বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রকাশিত হইবে।

গুণে বা অন্যান্য গুণে অন্যান্যের প্রতি একাগ্রতা হইয়া ক্রমশঃ উহা বিস্তৃত হইতে থাকে। এই বিস্তার কিয়ৎ পরিমাণে হইলে এবং কর্ত্তব্য বোধ জন্মিলে এক লক্ষ্য প্রধানতা (একাগ্রতার তৃতীয় অবস্থা) ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ তৎকালেও একটী বস্তুর প্রতি অটল একাগ্রতা থাকে বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্যের প্রতি যাইবারও কোন বাধা হয় না। পরে যখন বহু সংখ্যক গুণে একত্ব লাভ হইতে থাকে, তখন পুনরায় বহুত্বের বিলোপ-সহকারে একাগ্রতাও একত্বময়ী হইয়া উঠে, অর্থাৎ একাগ্রতার চতুর্থ অংশ একত্বময়তা বা পূর্ণ একাগ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে একাগ্রতা সাধন করিতে হয়।

একাগ্রতার দ্বিতীয় অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে একটী বস্তু প্রথমে অবলম্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া কিন্তু বিপরীত পথে চালিত হইয়া যোগ-সাধকেরা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া অবলম্বন না করিয়া কেবল পার্থিব ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ প্রথমে একটী পার্থিব বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করিয়া একাগ্রতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে, কেবল স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে অথবা কেবল মাতার চরণোপরি চক্ষুঃ রাখিলেই স্ত্রী ও মাতার প্রতি একাগ্রতা জন্মে না, প্রত্যুত প্রেম ও ভক্তি থাকিলে দর্শনব্যতীতও উহাঁদিগের প্রতি আত্মার একাগ্র ভাব জন্মে। সুতরাং কেবল নিরন্তর দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারাই যে একাগ্রতা হইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ কেহ কেহ শতরঞ্চ খেলিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, কৃষক কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে বলিয়া সে কখনই রাজনীতি বিষয়ে বহুক্ষণ মনোনিবেশ জনিত শ্রান্তি সহ্য করিতে পারে না এবং কেবল সাহিত্য বিষয়ে একাগ্র ব্যক্তিও

গণিত বিষয়ে একাগ্র না হইতেও পারেন, সুতরাং এইরূপ উপায় যে, একাগ্রতার বাহ্য আবরণ মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রকৃত একাগ্রতা, বিষয় বিশেষ মাত্র অবলম্বন করিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে থাকে না। আরও দেখ, একাগ্রতা একটী আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্ট গুণ, এজন্য ইহা লাভ করা আধ্যাত্মিক-ক্রিয়া সাপেক্ষ, সুতরাং পার্থিব ক্রিয়া মাত্র দ্বারা কখনই ইহার লাভ বা বৃদ্ধি সমীচীন বা প্রকৃতরূপে হইতে পারে না।

কি কি কারণে একাগ্রতার হ্রাস হয়?

একাগ্রতার বৃদ্ধির বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎ সমুদায় পাঠ করিলেই একাগ্রতার হ্রাস বিষয়েও অনেক জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু তৎ সমুদায় পাঠ মাত্রেই যে তদ্বিপরীত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের হইতে পারে, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ প্রেম প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আর এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

নিম্নলিখিত কতিপয় কারণে একাগ্রতার হ্রাস হইতে পারে।

(১) প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমল গুণের অন্বয়ি সাধনার ব্যাঘাত।

(২) প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমল গুণের কোন একটী অংশের পূর্ণতার অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যতিরেকি সাধনা।

(৩) নিয়মিত রূপে উপাসনা না করা,

(৪) অননুশীলন অর্থাৎ একাগ্রতা লাভার্থে অনুশীলন না করা;

(৫) ভক্তি সঙ্কট, প্রকৃত প্রেমভঙ্গ, মিত্রদ্রোহ প্রভৃতি হৃদয় ভেদিনী যাতনায় পড়িয়া শান্তি শূন্য হওয়া—

(৬) একত্ব লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন একটী গুরুতর কার্য্যে বা কৃচ্ছ্র সাধনে অতি ব্যস্ত থাকিলে অন্যান্য বিষয়ে একাগ্রতার অভাব হয়। ইত্যাদি।

একাগ্রতার আধার কি?

যদিচ জীবাত্মাও একাগ্রতার আধার বটে, কিন্তু জীবত্ব ধ্বংস না হইলে একাগ্রতার উচ্চতর ভাব লাভ করা যায় না। অতএব পরমাত্মাই একাগ্রতার প্রকৃত আধার।

একাগ্রতার পাত্র কে?

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই একাগ্রতার পাত্র। এবং একত্ব প্রাপ্ত হইবার পরে এই অনন্ত প্রায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রেম অঙ্কে বিরাজিত,স্নেহ-চরণে সমাশ্রিতও জ্ঞান জ্যোতিতে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত, সেই অনাদি অনন্ত অবাঙ্মনস-গোচর পরম পিতাই একমাত্র একাগ্রতার পাত্র, কারণ তখন "একমেবা দ্বিতীয়ং" জ্ঞান উপস্থিত হয়।

একাগ্রতা সাধনার ফল কি?

একাগ্রতা সাধনার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার যে কি ফল তাহা অনায়াসে জানা যাইতে পারে, কেননা ফল শব্দের অর্থ উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ কোন একটী কার্য্য করিয়া, উহা পশ্চাৎ যে ভাবে পরিণত হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের ফল। সুতরাং একাগ্রতা সাধনা করিয়া পরিণামে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাই একাগ্রতা সাধনার ফল। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ও পূর্ব্ব লিখিত অংশ সমূহ স্মরণ করিলে প্রতীতি হইবে যে, একাগ্রতা সাধনা করিয়া, একাগ্রতার চতুর্থ অংশ অর্থাৎ একত্ব-ময়তা (বা পূর্ণ একাগ্রতা) ই পরিণামে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব একত্ব-ময়তাই একাগ্রতা সাধনার অন্তিম ফল। অপর, একনিবিষ্টতাদি ও ইহার অংশবিশেষের ফল বটে, কিন্তু ঐ দুইটীকে প্রকৃত ফল বলা যায় না।

একাগ্রতার শক্তি কি?

আপাততঃ বোধ হয় যে, একাগ্রতা একটী গুণ, ইহার শক্তি কিরূপে সম্ভব? কেননা শক্তিমত্তা দ্রব্য পদার্থেই বিদ্যমান থাকে। দেখ, ঐ যে

অগ্নি দেখিতেছ, উহার শব্দ, স্পর্শ ও রূপ প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে এবং যে দাহিকা শক্তি আছে, তৎসমুদায় অনুধ্যান করিয়া তুমি অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবে যে, ঐ দাহিকা শক্তি না শব্দের, না স্পর্শের, না রূপের শক্তি, কিন্তু উহা অগ্নিরই শক্তি। আবার ঐ যে একজন অশেষ গুণ সম্পন্ন মহাত্মাকে দেখিতেছ, পাপীকে মুক্ত করিবার উহাঁর শক্তি আছে, সত্য, কিন্তু বল দেখি উঁহাতে যে সকল গুণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে কোনও গুণের কি এরূপ শক্তি আছে যে পাপীকে পাপ হইতে মুক্তি দান করিতে পারে? ইত্যাদি। এইরূপে যত দৃষ্টান্তই গ্রহণ কর না কেন, দেখিতে পাইবে যে শক্তি দ্রব্য-নিষ্ঠ, অর্থাৎ দ্রব্যেরই শক্তি আছে। গুণের কোনও শক্তি নাই।

স্থূল দৃষ্টিতে উল্লিখিত রূপ বোধ হইলেও বাস্তবিক যে গুণের শক্তি আছে। তাহা পশ্চাৎ বিবৃত করা যাইতেছে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি বা ইহার কোন অংশের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায় ইত্যাদি অর্থাৎ যে সমুদায় পদার্থকে আমরা দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করি, তৎসমুদায় আর কিছুই নহে, কেবল কতকগুলি গুণ সমষ্টি মাত্র, এই যে কাগজ নামক দ্রব্য পদার্থ দেখিতে পাইতেছ, ইহার বিষয়ে তুমি কি জানিতে পার? বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে ইহার শুভ্রত্ব, আয়তন, আকৃতি, কাঠিন্য প্রভৃতি কতকগুলি গুণই কেবল জানিতে পার এবং ঐ গুণ গুলি ও অন্যান্য আরও কতিপয় গুণ সমষ্টি ই যে, ঐ দ্রব্য পদার্থটী, তাহাতে আর সংশয় নাই। অন্য কথা দূরে থাকুক, যে অনন্ত শক্তি অনাদি অনন্ত পরম পিতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা তিনি কি পদার্থ? বিবেচনা কর, জানিতে পারিবে যে অনন্ত অনন্ত গুণ সমষ্টি মাত্র। "তুমি" কি পদার্থ

বিবেচনা কর, "আমি" কি পদার্থ ভাবিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তুমি, আমি, ইনি, উনি, তিনি প্রভৃতি এবং ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি সকলই কেবল অনন্ত সংখ্যক বা কতকগুলি গুণ সমষ্টি মাত্র। কেন না, যাহা হৃদয়ে ধারণা করা যায়, অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই যখন পদার্থ, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজ প্রভৃতির যখন কেবল গুণই ধারণা করা যায়, তখন গুণ ব্যতীত দ্রব্য পদার্থের অস্তিত্ব হইতে পারে না অর্থাৎ গুণাতিরিক্ত দ্রব্য নামক যে অন্য কোন পদার্থ আছে, তাহা অসম্ভব। এক্ষণে পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে যে, যদি গুণাতিরিক্ত দ্রব্য নামক কোন পদার্থ জগতে না থাকে, তবে কাষ্ঠের গুণ, জলের গুণ, অগ্নির গুণ, বায়ুর গুণ, আত্মার গুণ ইত্যাদি কথা কি মহাত্মা, কি দুরাত্মা, কি অশেষ শাস্ত্রা-স্থাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিরোমণি, কি শাস্ত্র জ্ঞানলেশ বর্জ্জিত মন্দবুদ্ধি মুর্খ, ইত্যাদি সকলেই কেন বলিয়া থাকেন? তাঁহাদিগের পক্ষে, বরং কাষ্ঠ গুণ, জল গুণ, আত্মা গুণ ইত্যাদি কথা প্রচলিত করাই উচিত ছিল। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রব্য ও গুণ যে এক পদার্থ নহে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

ইহার উত্তর এই যে, দ্রব্য ও গুণ বাস্তবিক একই পদার্থ। প্রভেদ এই যে, গুণ ব্যষ্টিভাব জ্ঞাপক এবং দ্রব্য গুণের সমষ্টি প্রকাশক। দ্রব্য বলিলে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি গুণ সমষ্টি বুঝায় আর গুণ বলিলে হয় 'ক', না হয় 'খ' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ানুসারে উচ্চারিত গুণ বা গুণগুলি বুঝায়। আবার দ্রব্যমাত্রই যে গুণের আধার, তাহাতেও সন্দেহ নাই, কেননা ঐ গুণসমষ্টিই প্রত্যেক গুণের আধার। যেমন "দড়ীর তাল", "ইটের স্তূপ" ইত্যাদি বলিলে আর অন্য কোন পদার্থকে বুঝায় না, কেবল কতকগুলি দড়ী বা কতকগুলি ইটের সমষ্টিকেই বুঝায়, তদ্রূপ "দ্রব্য" বলিলেও গুণভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না, কেবল কতকগুলি

গুণের সমষ্টিকেই বুঝায়। আবার, যেমন উল্লিখিত দড়ীর তালই উহার প্রত্যেক অংশের আধার, তদ্রূপ দ্রব্য বা গুণসমষ্টিই প্রত্যেক গুণের আধার।

এপর্য্যন্ত যাহা যাহা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে লিখিত হইল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, যখন গুণসমষ্টিই দ্রব্য এবং শক্তি দ্রব্যনিষ্ঠ, তখন শক্তি মাত্রেই যে গুণসমষ্টিতে বিদ্যমান আছে, তাহাতে আর সংশয় কি?

অপিচ, শক্তি যেমন গুণসমষ্টিতে আছে, তদ্রূপ প্রত্যেক গুণেও আছে। কেননা গুণসমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি থাকিলেও যখন এক একটী গুণদ্বারা গুণসমষ্টির ঐ এক একটী শক্তি প্রকাশিত হয়, তখন ঐ শক্তিটী ঐ গুণেরই বলিতে হইবে। মনে কর যেন আমাদিগের এই দেহের, খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিবার শক্তি আছে। ঐ চর্ব্বণশক্তি দন্তদ্বারা প্রকাশিত বা সূচিত হয়, সুতরাং দন্তের যে চর্ব্বণশক্তি আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপর, যদি চোয়ালের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগের স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তবে যেমন দন্ত সত্ত্বেও চর্ব্বণ হইতে পারে না, অথবা যেমন কতকগুলি দন্ত একটী মৃৎপাত্রাদিতে রাখিলে উহার চর্ব্বণ ক্ষমতা থাকে না, তদ্রূপ কোনও একটী গুণ, গুণসমষ্টির আশ্রয় ব্যতীত কার্য্যকারী হইতে পারে না। কিন্তু যেমন মুখের দন্তগুলি চর্ব্বণের মুখ্যভাবে ও নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া চর্ব্বণশক্তি দন্তনিষ্ঠ বলাই সঙ্গত এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলেই বলিয়াও আসিতেছেন, তদ্রূপ গুণসমষ্টির সাহায্যে কার্য্যকারী হইলেও যে গুণ মুখ্যভাবে যে শক্তির প্রকাশক, সেই গুণেরই সেই শক্তি আছে, বলিতে হইবে। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, গুণমাত্রেই শক্তিসম্পন্ন।

দ্রব্যগুণ বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটী বিষয়ের

নির্দ্দেশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না, পাঠকগণ! ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া শ্রবণ করিলে পরমানন্দিত হইব।

পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, এই জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই গুণ ও গুণময়, গুণ ভিন্ন দ্রব্য নাই, গুণ ব্যতীত ক্রিয়া হইতে পারে না, (কেননা যে দ্রব্যের ক্রিয়া হইবে, তাহাই গুণসমষ্টি মাত্র), দ্রব্যত্বাদি জাতিও গুণসাপেক্ষ, সম্বন্ধও গুণব্যতীত অসম্ভব এবং অভাবও গুণ বা গুণসমষ্টি প্রভৃতি ভিন্ন অন্যের হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যে দিকে দৃষ্টিপাত কর কেবল গুণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যাদিই প্রত্যক্ষ হইবে। কি জড় পদার্থ, কি আত্মা যে দিকে চাও দেখিতে পাইবে, সকলই কেবল গুণসমষ্টি। কি সৃষ্ট, কি স্রষ্টা যাহার বিষয়ই ভাব না কেন দেখিতে পাইবে, সকলই গুণময়। অতএব যে গুণ হইতে সৃষ্টি, যে গুণের সৃষ্টি, যে গুণদ্বারা সৃষ্টি, যে গুণেতে সৃষ্টি, যে গুণ সম্বন্ধে সৃষ্টি, যে গুণই স্রষ্টা ও যে গুণই সৃষ্ট, সেই নিখিল জগতের একমাত্র পরমপদার্থ—সেই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় পদার্থ যে গুণ, তাহার সাধনা না করিয়া, মানবাত্মা আর কিসের সাধনা করিতে যাইবে? আর জগতে সাধনীয় বস্তু কি হইতে পারে? কিছুই নহে। কি কুম্ভক, রেচক, পূরকাদি সম্পাদক, কি রসনা পরিচালক, কি নেতিধৌতি প্রভৃতি নির্ব্বাহক, কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ ইহাঁরা যতই অস্বীকার করুন না কেন? ইহাঁরা সকলেই যে গুণ সাধনা করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাঁদিগের মধ্যে কেহ জড়ীয় গুণের, কেহ আত্মার গুণের অংশবিশেষের, কেহ কেহ মধ্যমরূপ একটী গুণের এবং কেহবা ২ বা ৩টী গুণের মাত্র সাধনা করেন, কিন্তু মহাত্মা সাধকগণ অনন্ত গুণের অনন্ত সাধনা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহারা জড়ীয় ও নিকৃষ্ট গুণগুলি পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট গুণসমূহের সাধনা দ্বারাই নিখিল গুণের সাধনার ফল

লাভ করিতে সমর্থ হন। ধন্য গুণ সাধনা! তোমার গুণের সীমা নাই। ধন্য সত্য ধর্ম্ম! তোমার মহিমা অসীম। ধন্য মহাত্মা গুণ-সাধকগণ, তোমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি! ধন্য ধন্য, ওঁং, তোমাকে অনন্ত ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি যে অসীম মানবের মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ এতাদৃশ অনন্ত গুণসম্পন্ন গুণ সাধনাও ঐ গুণসাধনাত্মক সত্যধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে অনন্ত অনন্ত ধন্যবাদ অনন্তবার অনন্তকাল প্রদান করিব!!!!!!!

পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, গুণমাত্রই শক্তিসম্পন্ন, আবার একাগ্রতাও একটী গুণ, সুতরাং একাগ্রতার যে শক্তি আছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

একাগ্রতার শক্তিপ্রভাবে যাবতীয় গুণ উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও অনন্তাভিমুখে ধাবিত বা লীন হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে একত্বে উপস্থিত হইতে পারে। একাগ্রতার শক্তিবশতঃ অণুর মধ্যে অনন্ত ও অনন্তের মধ্যে অণু উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং একাগ্রতার শক্তি দ্বারা নির্লিপ্ততাদি, পরমাত্মার গুণলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

একাগ্রতার কার্য্য কি?

পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণদ্বারা একাগ্রতার শক্তির সত্তা সপ্রমাণ হইয়াছে। তৎসমুদায় অবলম্বন করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, একাগ্রতার কার্য্যও আছে। অপর, একাগ্রতার কার্য্য যে কি কি, তৎসমুদায় আর পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ না করিয়া এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে গুণসাধনাদ্বারা ক্রমশঃ অংশের পূর্ণতা সাধন হয়, একাগ্রতা তাহারই স্বতঃপরতঃ পরমোৎকৃষ্ট অংশ বিধায়িনী।

ধ্বংস ও লয়ে প্রভেদ কি?

একাগ্রতার ধ্বংস বা লয় আছে কি না?

ধ্বংস শব্দের অর্থ বিনাশ এবং লয় শব্দের অর্থ উৎপাদকে পরিণত বা

পরিবর্ত্তিত হওয়া, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, জগতে কোনও দ্রব্য বা গুণ পদার্থের ধ্বংস নাই, কেবল অবস্থা সমূহেরই ধ্বংস আছে। আর লয়ের বিষয়ে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি গুণের ও নিখিল জড় পদার্থেরই লয় আছে। গুণের মধ্যে কতকগুলি সরল গুণের, কতিপয় মিশ্রগুণের এবং যাবতীয় জাতগুণেরই লয় হইতে পারে। সরলগুণের মধ্যে মমতা প্রভৃতির এবং মিশ্রগুণের মধ্যে পার্থিব ভক্তি প্রভৃতির লয় হইয়া থাকে। কোন গুণের লয় হইলে, সেই গুণ একেবারে রহিত হয় না, তবে লীন হইলে উক্ত লয়শীলগুণ লয়-ভাজনগুণের সম্পূর্ণ অন্তর্গত হয় মাত্র। যেমন পার্থিব ভক্তির লয় হইলে, পার্থিব ভক্তির ক্রিয়া একেবারে রহিত হয় না কেবল পার্থিব ভক্তির লয়-ভাজন গুণের (অর্থাৎ প্রেমের) ক্রিয়া সতত আবরণরূপে প্রতীয়মান হয়। ধ্বংস ও লয়ে এই প্রভেদ।

পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিত হইল তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, একাগ্রতার ধ্বংস বা লয় নাই। তবে যাবৎ পূর্ণভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ উহার ক্ষীণতা বা হ্রাস হইতে পারে মাত্র।

একাগ্রতার বিষয়ে শাস্ত্রে কি আছে ?

একাগ্রতার বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের কোন এক স্থানে সবিশেষ বিবরণ নাই। তবে স্থানে স্থানে যাহা লিখিত আছে, তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া এস্থলে লিখিত হইল।—

প্রথমতঃ, পাতঞ্জল যোগসূত্রে সাধন পাদে লিখিত আছে যে,—

শৌচাৎ * * *

কিঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্রতেন্দ্রিয়-

জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানিচ ॥ ৪০ । ৪১ ।

অর্থাৎ শৌচ হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শন যোগ্যতা হয়।

পরে বিভূতি পাদের ১১শ ও ১২শ সূত্রে লিখিত আছে যে,—

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ
চিত্তস্য সমাধি পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

অর্থাৎ সর্ব্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয়ই চিত্তের সমাধি পরিণাম।

অপিচ,

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা-
পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

অর্থাৎ শান্ত ও উদিত অবস্থায় তুল্য প্রত্যয় অর্থাৎ তুল্যাবস্থা (সমভাব) চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, পতঞ্জলি একাগ্রতার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। উহা সত্য-ধর্ম্মানুসারে লিখিত একাগ্রতার চারিটী অংশের মধ্যে দ্বিতীয় অংশের আভাস মাত্র।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, তন্ত্রে এবিষয়ের কি আছে? তান্ত্রিকেরা তন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনার্থে বলিয়া থাকেন যে,

নিগমাদাগমোজাতঃ আগমাদ্ যামলোঽভবৎ
যামলাদ্ বেদসংজাতং বেদাঙ্গ্‌জাতং পুরাণকং।
পুরাণাৎ স্মৃতিসংজাতং স্মৃতেঃ শাস্ত্রাণি যানিচ,
তানি গ্রাহ্যানি যত্নেন চোত্তমংহি ক্রমোৎ ক্রমাৎ ॥

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, নিগম, আগম ও যামল এই তিনটী

শাস্ত্র বেদেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই বাক্যের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। উল্লিখিত বচননিচয়দ্বারা তন্ত্রের শ্রেষ্ঠতার বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ তন্ত্রশাস্ত্র নিগমাগম-যামলাত্মক।

তন্ত্র শাস্ত্রের মধ্যে জ্ঞান সঙ্কলিনীতে একাগ্রতার নাম নাই, কিন্তু এরূপ কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ আছে যাহাদিগকে এতদ্দেশীয় লোকে একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। যথা—

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনং।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী ॥
কিংবা, তামেব মুদ্রাং বিচরন্তি খেচরীং ॥

শেষোক্ত পাঠটাই অধিক সঙ্গত বলিয়া আমরা তদনুসারে অর্থ করিলাম। যে মুদ্রা প্রভাবে অবলম্বন ব্যতীত মন স্থির হয়, নিরোধ ব্যতীত দেহস্থ বায়ু স্থির হয় এবং দর্শন ব্যতীত চক্ষুঃ স্থির হয়, তাহাকে খেচরী মুদ্রা কহে। যদি এইটাই শাস্ত্রোক্ত একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা হয়, তবে উহা প্রকৃত একাগ্রতার দ্বিতীয় অংশ মাত্র, সুতরাং অতি স্থূল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একাগ্রতা হইলে মনঃ স্থির হয়, এবং মনঃ স্থির হইলে বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হয়, ইহা দেখিয়া, একাগ্রতার্থীদিগের মধ্যে কেহ কেহ চক্ষুঃ স্থির করিতে অভ্যাস করেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে, সুরাপান করিলে শরীর উত্তপ্ত হয় বলিয়া শরীর উত্তপ্ত করিলে সুরাপান জনিত আনন্দ, ও মত্ততা কখনই হইতে পারে না এবং অধিক পরিমাণে বাহ্য তাপ সংযোগে উত্তপ্ত করিলে শরীর দগ্ধ হইয়া অসহ্য

যাতনা উপস্থিত করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টি-স্থিরতা সাধনাকারা দিগেরও ঐ দশা হয় অর্থাৎ তাহাদিগের দর্শন শক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে।

এই পথাবলম্বীরা বলেন যে, এইরূপ করাতেই যে, আজকাল লোকের দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হইতেছে এইরূপ বলা যায় না, কেননা এই প্রণালী ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই অবলম্বিত হইয়াছে, যদি ইহাতেই বাস্তবিক দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হইত, তবে এতকাল হয় নাই কেন? বিশেষতঃ যখন এবিষয় শাস্ত্রেও লিখিত আছে, তখন ইহা দূষ্য বা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রণালী যে যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে, প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সংপশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশ শ্চানবলোকয়ন্,
রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসস্তথা
সংস্থাপ্য নির্ম্মলে সত্ত্বে স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ।
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে যোগি চিকিৎসা নামাধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে যে, চতুর্দ্দিক দর্শন না করিয়া কেবল নাসিকার অগ্রভাগ দর্শন করিবে এবং রজোগুণ দ্বারা তমোগুণের ও সত্ত্ব-গুণদ্বারা রজোগুণের বৃত্তিকে সংস্থাপন করিয়া (কার্য্য নিবৃত্ত করিয়া) নির্ম্মল সত্ত্বগুণে অবস্থান পূর্ব্বক যোগবিৎ যোগ করিবেন।

এখন দেখ, অগ্রে গুণ সাধন আবশ্যক, কেননা রজস্তমোগুণের নিরোধ যে কিরূপে করিতে হইবে, তাহা গুণসাধনা ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। তৎপরেও চক্ষুঃ প্রসারিত করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে না,

কেবল নাসিকাগ্রে ঈষৎ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুঃ স্থির করিবার জন্য যে উপায় কতকগুলি লোকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা যুক্তি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ, সুতরাং পরিত্যাজ্য সন্দেহ নাই।

অপর, মনঃস্থির করিবার জন্য বায়ুস্থির করিবার যে যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ও উৎকৃষ্ট নহে। কেননা বায়ু স্থির করিতে যে কুম্ভক রেচকাদি করা হয় অথবা রসনা চালনা করিতে হয়, তৎসমুদায় অবলম্বনেও অনেকে অনেক প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। যদি কষ্টে সৃষ্টে সেইরোগ হইতে মুক্তি পান. তথাপি ইন্দ্রিয়বিশেষের তেজো-হানি হইয়া থাকে। আর তাহাও যাঁহাদিগের না হয়, তাঁহারা বহু বর্ষ ঐ সাধনা করিয়া যে ফললাভ করেন, সত্যধর্ম্মাবলম্বীরা গুণ সাধনা করিয়া তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ফল ও আনুষঙ্গিক ঐ ক্ষুদ্রতর ফলের ন্যায় অসংখ্য অসংখ্য ফললাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং উহাও যে নিকৃষ্ট উপায়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেও বায়ু সাধনা কর্ম্মযোগ বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে এবং উহা নির্ব্বেদশূন্য কামীদিগের জন্যই নিরূপিত হইয়াছে। যথা—শ্রীভগবানুবাচ

যোগা স্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া,
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কশ্চন ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনা মিহ কর্ম্মস্থ
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণ-চিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং।
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

ইতি ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২০ শাধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

আমি মানবগণের মঙ্গল-বিধানেচ্ছায় তিন প্রকার যোগের কথা বলিতেছি। যথা জ্ঞান-যোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এতদ্ব্যতীত অন্য আর উপায় নাই। নির্ব্বেদ যুক্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞানযোগ, প্র সদ্ধ কম্ম সমূহে অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত ন্যাসকারী কামীদিগের কর্ম্মযোগ এবং আমার কথাদি শ্রবণে শ্রদ্ধাবান এবং অনির্ব্বিণ্ণ ও অনতিসক্ত ব্যক্তিদিগের ভক্তি-যোগ সিদ্ধি-প্রদ হইবে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, ভক্তিভোগ ও জ্ঞানযোগ কম্মযোগ অপেক্ষা প্রধান। কেবল নির্ব্বিণ্ণদিগের জন্য জ্ঞানযোগ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আর যাহারা নির্ব্বিণ্ণও নহে, অত্যন্ত সংসারাসক্তও নহে এবং যাঁহারা ঈশ্বর বিষয়ক বচন শ্রবণ করিতে শ্রদ্ধাবান্, তাহাদিগের জন্য ভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে। অনন্তর, যাহাদিগের নির্ব্বেদ-লেশ নাই এবং যাহারা অত্যন্ত কাম-পরায়ণ (অর্থাৎ সংসারাসক্ত); সেই সকল ন্যাসকারী দিগের জন্যই কর্ম্মযোগ কথিত হইয়াছে। সুতরাং শেষোক্তেরা যে নিকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অপিচ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগ যে দুইটী উৎকৃষ্ট গুণের সাধনা, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যদিও ঐ দুইটীও যোগশব্দে কথিত হইয়াছে, যদিও উহাদিগের সাধনার সবিশেষ বিবরণ আর্য্যশাস্ত্রে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি ঐ দুইটীই যে গুণ সাধনার অন্তর্গত ইহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। অতএব শাস্ত্রকারদিগের মত আলোচনা করিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা বায়ু সাধনা কর্ত্তব্য বলিলেও উহাকে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, যৎকালে পৃথিবীতে গুণসাধনার প্রচার হয় নাই, অনন্ত গুণশালিনী গুণ-সাধনা-পতাকা জগদ্বাসীর হৃদয়-

মন্দিরের অভূতপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে নাই, গুণ-সাধনারূপ অমূল্য অতুল্যমণি মানব-মনের বিকট সঙ্কটাকীর্ণ দুরপনেয় গাঢ়ান্ধকার অপনীত করিয়া, বিমল বিভায় স্বকীয় অতুল সৌন্দর্য্য কান্তি বিকসিত করে নাই, এবং অনন্ত রত্নরাজি বিরাজিত গুণ সাধনা গৃহের সুপ্রশস্ত কপাট নিচয় উদ্ঘাটিত ও তন্মধ্যে মানবগণ প্রবিষ্ট হইয়া, মানব জন্মের সার্থকতা, জীবত্বনাশ ও অংশের পূর্ণতা সাধনোপায় রূপ সর্ব্বপ্রধান রত্নত্রয় প্রাপ্ত হইয়া বিমোহিত হয় নাই, তখনও যে সাধনা—তৎকালেও যে যোগ সাধনা—বায়ু সাধনা নিকৃষ্টতম শ্রেণীস্থ—সর্ব্ব নিম্নবিভাগের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুণ সাধনা প্রচারের পরেও তাহা হইতে কতকগুলি লোক নিবৃত্ত হইল না! অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়—অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অদ্যাপি কতিপয় লোকেও ঐ সাধনায় ব্যাপৃত হইতেছে!!! আহা! মনুষ্যের উদ্ধার কি দুর্লভ! কি সুদুর্লভ!! মানবগণ কি মোহমন্ত্রমুগ্ধ!!! নরকের নারকীয় ভাব কি আপাত সুখকর!!!! হে নাথ! কবে সুদিন সমাগত হইবে? কবে জগদ্বাসীর ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে গুণসাধনা স্বাধিকার বিস্তার করিবে এবং কবে তোমার অনন্তমঙ্গলময়ী ইচ্ছা জগদ্বাসী বুঝিতে পারিয়া, তাহার অনুগত হইবে??? দয়াময়! দয়াকর!!

ওঁ

গুরুতত্ত্ব।

সৃষ্ট জগতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তীর সাহায্য সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। মনুষ্য জাতি যে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক আজ সভ্যতার উচ্চ পদবীতে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আজ যে তাঁহারা আদিম মানবের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, অযত্ন-লভ্য ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছেন না, আজ যে তাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ শক্তির অভাবে পর্ব্বত গুহায় আশ্রয়লাভে চরিতার্থতা বোধ করিতেছেন না, এবং অদ্য যে তাঁহাদিগকে অতি প্রাচীন কালীন নরগণের ন্যায় ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টিপাত, প্রখর আতপতাপ ও দুঃসহ শীতবাত ক্লেশ প্রভৃতি সহ্য করিতে হইতেছে না, প্রত্যুত তাঁহারা সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিয়া সর্ব্ববিধ ক্লেশরাশি হইতে বিমুক্ত থাকিতে শক্তিমান্ হইয়াছেন, ইহার মূল কি পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সাহায্য নহে? মানব! তুমি যে অদ্য নরযান, অশ্বযান, করিযান, অর্ণবযান, বাষ্পীয়যান, ব্যোমযান, তাড়িতযান প্রভৃতিতে আরোহণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বতন নরজাতির তুলনায় অত্যদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়-মান হইতেছ, ইহার প্রকৃত কারণ কি পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণের সহায়তা নহে? তুমি যে আজ ঘটিকা যন্ত্র, তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র ও স্বরধারক যন্ত্র (Gramophone) আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছ, ইহার কারণ বলিয়া কি পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যবর্গের সহায়তা উল্লিখিত হইতে পারে না? অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান উন্নতি ও ভাবিনী সমুন্নতির প্রত্যেক অঙ্গেই পূর্ব্ববর্ত্তী মানববর্গের সাহায্য চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে অতিবিশদরূপে বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। এমন

কি, যদি প্রত্যেক মানবই পূর্ব্ববর্ত্তী মানবের সাহায্যে বঞ্চিত থাকিত, তবে আধুনিক মানবে ও সৃষ্টির প্রথম মানবে কোনও প্রভেদ থাকিত না। তবে আজ হিমপ্রধান স্থান হইতে গ্রীষ্ম প্রধান স্থান পর্য্যন্ত যে মানববাস লক্ষিত হইতেছে তাহাও পরিলক্ষিত হইত না। প্রত্যুত বিপুল বল সম্পন্ন অষ্টপদবিশিষ্ট শরভ জাতির ন্যায় ইহাদিগেরও বিলোপ সাধন হইত। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মানবের সাহায্য গ্রহণই সভ্যতার ও উন্নতির নিদান এবং এই সাহায্য গ্রহণ করা প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হইবে যে যখন সামান্য পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক, তখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য যে ঐ সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। কারণ পার্থিব বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য চক্ষু-রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যেরূপ সহায়তা করিতে পারে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহা-দিগের দ্বারা সেরূপ সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে জ্ঞানলাভার্থ যাঁহাদিগের সাহায্য গৃহীত হয়, তাঁহারাই গুরু বলিয়া অভিহিত হন। সুতরাং গুরু স্বীকার ও গুরু-বরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যেরা সকলেই ধর্ম্মলাভার্থে গুরুর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য সকলেই গুরু স্বীকার করিয়াছেন। য়িহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানগণও গুরু মানিয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামি প্রভৃতি প্রথমে গুরু মানিতেন না, কিন্তু শেষ সময়ে গুরু মানা অত্যাবশ্যক বলিয়া গিয়াছেন এবং স্বয়ং গুরুগিরিও করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রও প্রথমে গুরু মানিতেন না, কিন্তু শেষে তিনি খৃষ্টকে গুরু বলিয়া

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং নববিধান দলের গুরুর পদ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই যে, আদি সমাজেও গুরু করণ আছে। অতএব দেখাযায় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণই গুরু মানিয়া থাকেন।

প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মেই গুরুবাদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্বল্পকাল প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের শাখা বিশেষে গুরুর প্রয়োজন স্বীকৃত হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আদি সমাজ ও নববিধান সমাজ গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। গুরু স্বীকার না করা যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতের একাংশ মাত্র তাহা নহে, তাঁহারা উহাকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের এইমত যে অতিশয় ভ্রান্তিপূর্ণ ও জগতের মহানিষ্ট কারক, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমতঃ, উহা ক্রমপূর্ণ এবং দ্বিতীয়তঃ, সকলের উন্নতিই পরকীয় সাহায্য সাপেক্ষ। এক মুহূর্ত্তে ইহার কিছুই হয় নাই এবং একমুহূর্ত্তে ইহার কিছুই যাইবে না। "ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল" ইহা ভক্তের উক্তি হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীর উক্তি নহে। এই সৃষ্টি যে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কোনও কোনও ধর্ম্ম-পুস্তকে যে দশ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, উহা একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কত শত শত দশ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি সুনির্ণীত হয় নাই। পক্ষান্তরে দেখ, মনুষ্য এক দিনে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহাদের মানবাকার ধারণের পূর্ব্ব অবস্থার চিন্তা পরিত্যাগ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে

পিতার চেষ্টায় মাতৃগর্ভে বীজাধান হইয়াছে, তৎপরে নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে এবং তৎকালে জীব মাতার সাহায্যেই জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছে। এই সময়ে জননার বিরুদ্ধাচরণের কথা দূরে থাকুক, সাহায্যের অভাব হইলেও একমুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও মাতা পিতার সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনের আশা থাকে না। তখন সে উল্লিখিত সাহায্যেই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পুষ্টাঙ্গ হইয়া ভূলোকে অবস্থানের উপযুক্ততা লাভ করে। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুষ্য মাতা পিতার সাহায্যেই ভূলোকে আগমন ও জীবন ধারণ করিতে সামর্থ্যলাভ করে। ইত্যাদি। এজন্য ইহা স্বীকার করা অনুচিত নহে যে, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতিই পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণের সাহায্য সাপেক্ষ।

এই সকল যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও ব্রাহ্মগণ বলেন যে, "পরম পিতাকে ডাকিতে অন্যের সাহায্যের দরকার নাই, কারণ আমরা তাঁহাতেই যুক্ত আছি। মাতার কাছে শিশু দুগ্ধ চাহিবে, তাহার জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন কি?" ইহার উত্তর এই যে, তোমরা যে ঈশ্বরে যুক্ত আছ, তোমাদিগের এ ধারণা কোথায়? মুখে বলিলেই ত হয় না, ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহার ঐরূপ ধারণা হইয়াছে, সে অনন্ত প্রায় বিপদে পতিত হইয়াও অধীর হয় না। জলে, অনলে বা পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও স্থিরচিত্তে থাকিতে পারে; কেন না পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী। এ বিষয়ে বাগাড়ম্বর না করিয়া এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঐরূপ ধারণাও গুরুকৃপাসাপেক্ষ। গুরুকৃপা ব্যতিরেকে কোনও উচ্চতর জ্ঞান দৃঢ়মূল হইতে পারে না। যাহা হউক এক্ষণে তোমাদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অবলম্বনে উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

পরম পিতা পরমেশ্বর মানবগণের পক্ষে এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ

কর; যত সহজ করিয়া রাখিয়াছেন, আধ্যাত্মিক জগতে গমন ও তথায় বাস করা তত সহজ করেন নাই। এবিষয় যে কেবল আমিই বলিতেছি তাহা নহে, অন্যান্য জ্ঞানীরাও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন যে,

বৃত্ত্যর্থং নাতিচেষ্টেত সাহি ধাত্রৈব নির্ম্মিতা।

অর্থাৎ জীবিকার জন্য অতিচেষ্টা করিও না, কেন না তাহা বিধাতাই নিম্মাণ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য যে, সামান্য চেষ্টাতেই তাহা লাভ করা যায়। অন্যত্র দেখ,

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।

অর্থাৎ এজগতে নরত্ব দুর্লভ, আবার নরজন্ম প্রাপ্তদিগের পক্ষে বিদ্যালাভ সুদুর্লভ। এখানে বিদ্যাশব্দে ব্রহ্মবিদ্যা ধরিলে ত আর কোনও কথাই থাকে না। কিন্তু যদি অপরা বিদ্যার কথা ধর, তাহা হইলেও ইহা বুঝা যাইতেছে যে, অপরা বিদ্যাই যখন সুদুর্লভ, তখন পরা বিদ্যা আরও কত অতি সুদুর্লভ।

বাইবেলে লিখিত আছে যে,

"Enter ye through the small gate; for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there are that enter through it. How small is the gate and narrow is the way that leadeth to life! and few there are that find it".

"সঙ্কীর্ণ দ্বারদিয়া প্রবেশ কর, কেন না সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে। কারণ জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকে তাহার উদ্দেশ পায়।" এতদ্ভিন্ন কোন ভক্ত ব্রাহ্মও স্বকৃত সঙ্গীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে,

"সাধন ভজন বিনা কে পায় ব্রহ্মদরশন,
যদি সহজ হ'ত, সবাই পেত, কে করত সাধন ভজন ?

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ যে, মাতাকে এক ডাক বা দুই ডাক দিলেই হয়ত তিনি উত্তর দিবেন, কত আদরের সহিত শিশুর মুখ চুম্বন করিবেন, এবং সেই আদরের ধন যাহা চাহিবে, তাহা তাহাকে দিবেন। হয়ত স্নেহবশতঃ ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াও সন্তানের প্রার্থিত বস্তু তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু পরমপিতার প্রকৃতি যে তদ্রূপ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি "ডাকার মতন ডাকা" না হয়, তবে সহস্র ডাকেও কোনও জবাব পাওয়া যাইবে না ; এই "ডাকার মতন ডাকা" শিক্ষাসাপেক্ষ, মুখের কথায় হয় না। বহু সাধনা দ্বারাও এই প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। এই শিক্ষার জন্যই গুরুর প্রয়োজন। অতএব গুরুবাদ স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কেহ স্বীয় যত্নে স্বাধীনভাবে (গুরুর সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে) পরমপিতার মঙ্গল চরণ লাভে সমর্থ হইত, তবে তাঁহার ক্রমবর্তী সৃষ্টির ত্রুটি হইত, বলা যাইতে পারে। তবে এস্থলে ইহা বলিয়া রাখাও আবশ্যক যে, "পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যে অন্য কেহ নাই" ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এই জ্ঞান স্বকীয় সম্পূর্ণ স্বাধীন চেষ্টাদ্বারা লাভ করা যায় না। গুরুই এই জ্ঞানদাতা।

আরও দেখ, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মগণও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন না। তাঁহারাও নানাশাস্ত্র ও সাধুগণের জীবনচরিত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। উক্ত পুস্তকাদি ও জীবনীসমূহ যে তাঁহাদের গুরুর অনেক কার্য্য করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে নানারূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা দ্বারা নিজ জীবন গঠন করিলেই কি যথেষ্ট হয় না ?

ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবীতে এত অধিক পরিমাণে ও আপাততঃ পরস্পর বিরোধিরূপে এত অধিক উপদেশ রহিয়াছে যে তাহা হইতে আপনার উপযোগী জিনিষ, পরমোন্নত কোনও ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত বাছিয়া লওয়া অসম্ভব। এই জন্যই ব্রাহ্মসঙ্গীত বিশেষে এই গান রচিত হইয়াছে যে,

"নানা কথার ছলে নানা মুনি বলে, সংশয়ে তাই
ভুলি হে। ইত্যাদি।"

অপর, আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে পরকীয় সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা ব্রাহ্মদিগের আচরণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাঁহারা মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য, নবজাত শিশুর কল্যাণের নিমিত্ত এবং নবদম্পতির ভাবি সুমিলন জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন মনে করিয়াই তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করেন, নিশ্চয়ই এবিষয়ে অন্য উদ্দেশ্য নাই। আবার, কোন কোন ব্রাহ্ম সমবেত উপাসনার বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা বিশেষভাবে উপকারী। ইহার মূলেও যে পরকীয় সাহায্য রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব অন্যের সাহায্য যে আমাদের আবশ্যক, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। যদি আপনার অপেক্ষা হীন, সম বা অল্পোন্নত ব্যক্তির প্রার্থনায়ই আমার উন্নতি হইতে পারে, তবে অশেষ গুণ বিভূষিত পরমোন্নত ও ভগবৎ প্রেমসুধাপানে নিরন্তর রত গুরুদেবের সাহায্যে যে আমি বিশেষভাবে উন্নত ও অবশেষে পরম পদলাভে সমর্থ হইব, ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

ব্রাহ্মেরা গুরুবাদ স্বীকার না করার আর একটী কারণ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন, "কোনও শাস্ত্র বা কোনও মানব অভ্রান্ত নহে।" প্রায় শাস্ত্রই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা আমরাও স্বীকার করি। তবে

অনেক শাস্ত্র ভ্রমশূন্য হইলেও তাহা যে তদ্রূপ, তাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বুঝা সুকঠিন। আমাদের মতেও পরম পিতাকে আদর্শ জ্ঞান করিতে হইবে এবং প্রত্যেক মানব অভ্রান্ত না হইলেও পরমপদ প্রাপ্ত সাধক যে আমার উপযোগী বিষয়ে অভ্রান্ত, ইহা স্থির-নিশ্চয় জানিবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি ঐ যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে দেখিতেছ, উনি অভ্রান্ত নহেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বটে, কিন্তু বর্ণ পরিচয় শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে উহাঁকে অভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে যে, কোনও দোষ হইতে পারে না, ইহাও বোধকরি সর্ব্ববাদি সম্মত। আরও দেখ, ইহা স্বীকার না করিলে কি শিক্ষা, কি দীক্ষা কোন সাধনই হইতে পারে না। কারণ, তুমি কোন্ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সাধন করিবে? বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, চঞ্চল ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সাধন করা অসম্ভব। গুরু অস্বীকার করায় ও গুরুর অভাবে উপযুক্ত উপদেশ না পাওয়ায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত কোনও ব্রাহ্ম পরমপিতার দর্শনলাভে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এই জন্যই "দর্শন" শব্দটী (misleading) ভ্রান্তিমার্গ প্রদর্শক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাতিশয় দুঃখের সহিত লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহারা নিজের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় ধর্ম্মকে কল্পনা বলিয়াও জ্ঞান করেন। এমন কি, তাঁহারা পরমপিতার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সংশয়ী হন। তাঁহাদের গানেই ইহা দেখা যাইতেছে। যথা,—

তীক্ষ্ণ বিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যখন মোহ পরমাদে নাথ, তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।"

ব্রাহ্মেরা বলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম সত্যসংগ্রহ করিতেছে। ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই। যদি নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বে স্বীয় কর্ত্তব্য

কর্ম্মে অচল অটল বিশ্বাস না থাকে, যদি স্বাবলম্বিত ধর্ম্মই একমাত্র অত্যুৎকৃষ্ট পথ বলিয়া জ্ঞান না থাকে, তবে কিরূপে সেই ধর্ম্মের অবলম্বনে সাধন করিবে? ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ, "ভবিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম লক্ষণম্।" অর্থাৎ ইহা হইবেই হইবে, এই বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। সাধন সময়ে সে কি এই কথা মনে করিবে না যে, "যাহা করিতেছি, তাহা বোধ হয় সত্য নহে; ইহা বোধ হয় প্রকৃত পথ নহে, ইত্যাদি।" এইরূপ ভাব হৃদয়ে থাকিলে যে কিছুতেই কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তাহা সাধক মাত্রেই অবগত আছেন। ধর্ম্মরাজ্যে অচল অটল বিশ্বাস আবশ্যক। চঞ্চলচিত্তে কার্য্য করিলে স্বল্প ফললাভ ও দুর্লভ।

কোনও কোনও ব্রাহ্ম বলেন যে, "ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তাঁহার শক্তিপ্রভাবে গুরুর অভাবেও যে মুক্তি হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করা উচিত নহে।" ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর যেমন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তেমনই তিনি ক্রমময়ী সৃষ্টির বিধাতা। তাঁহাতে অনন্তগুণ এরূপভাবে রহিয়াছে যে কোনও গুণ অন্যগুণের বিরোধী নহে। তিনি যেমন অনন্ত ন্যায়পরায়ণ বলিয়া পাপীর শাস্তিদাতা, তেমনই অনন্ত প্রেমনিধান বলিয়া পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা। অতএব যিনি সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও নিশাবসানে একেবারে মধ্যাহ্ন উপস্থিত করেন নাই এবং দিবা-বসানে একেবারে নিশীথের উপস্থিতিও সম্পাদন করেন নাই। ফলতঃ ক্রমানুসারেই ঐ মধ্যাহ্নের ও ঐ নিশীথের উপস্থিতির সুনিয়ম করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য যে ক্রমপূর্ণ ইহাতে সন্দেহ কি? যিনি ভূমিষ্ঠ সন্তানকে একেবারে বলবত্তা প্রদান করেন নাই, একেবারে পুষ্টিকর মাংস গোধূমাদি সেবনের অধিকার অর্পণ করেন নাই; প্রত্যুত প্রথমাবস্থায় মাতৃস্তন্যদ্বারাই তদীয় পরিপোষণের সুনিয়ম করিয়াছেন; তাঁহার রাজ্যে ক্রম পরিত্যাগ

করা এবং তন্নিবন্ধন ব্রহ্মদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উল্লেখ করা যে একান্ত উপহাসের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তৎপাঠে মনস্বী পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, গুরুস্বীকার না করিলে বহু দোষ সমুৎপন্ন ও প্রকৃত সাধনার ব্যাঘাত সংসাধিত হয়, অতএব গুরুকরণ যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

জগতে যখন কোনও দোষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহার উচ্ছেদের সঙ্গে প্রায়ই বহুগুণের বিলোপ সাধন হইয়া থাকে। বঙ্গবাসিগণ সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া মিরজাফরকে যে নবাব করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সংঘটিত হইলে সিরাজের অত্যাচার হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন বটে, কিন্তু ততোঽধিক অত্যাচারী অপর একজনের অধীন হইয়া পড়িতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলনের সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের বহু শাখায় গুরুগণের এরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে ইচ্ছা হয় না। ঐ অত্যাচার প্রভাবে শিষ্যা বলিয়া পরিগণিতা সতীর সতীত্ব নাশ অহরহঃ সংঘটিত হইত এবং শিষ্যদিগের ধনরাশির অধিকাংশ গুরুপাদ-পদ্মে নিবেদিত হইত। এ দোষ যে এখনও গিয়াছে, তাহা নহে। এই সকল দর্শন করিয়া এবং ইউরোপে (Pope) পোপের অত্যাচার অতিশয় প্রবল হওয়াতে লুথারের অভ্যুত্থান স্মরণ করিয়া, গুরুকরণ অশেষ দোষাকর বলিয়াই, ব্রাহ্মগণ স্থির করিয়াছিলেন। আমরাও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এরূপ গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ অপেক্ষা আজীবন অদীক্ষিত থাকা শত শত গুণে মঙ্গল দায়ক। গুরুত্ব যাঁহাদের ব্যবসায়, যাঁহারা (Census) সেন্সাসের সময়ে ব্যবসায় (Column) কলমের স্থানে "গুরুত্ব" কথাটী লিখিতে সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হন না, তাঁহারা যে প্রকৃত গুরু নহেন, তাহা বলাই

বাহুল্য। এবিষয়ের বিবরণ স্থানান্তরেও লিখিত হইয়াছে, তথাপি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যদি পরস্পর বিপরীত শাস্ত্র যুগ্মে অধিকারী, শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, কামাদি জাতগুণ সমূহের লয়ে সমর্থ, নিয়ত পরমেশ্বর-পরায়ণ ও জীবন্মুক্ত গুরুলাভ করিতে পার, তবেই তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে। কারণ পরমেশ্বরদর্শী সাধক ভিন্ন কেহই গুরু হইতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মগণ যে সকল অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া গুরু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেকেই দোষ পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে গুণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং গুরুর অস্বীকার করায় ব্রাহ্মদিগের প্রতি সাময়িক অবস্থা পর্য্যালোচনাকারী মনস্বিগণ সবিশেষ দোষ প্রদান করিতে পারেন না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শিক্ষা-গুরু, সর্ব্ববাদি সম্মত; কিন্তু দীক্ষা গুরু স্বীকারে প্রয়োজন কি? জগদীশ্বর ও মানব ইহার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া একজনকে মানি কেন? আমরা কি মধ্যবর্ত্তি ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উপযুক্ত হইতে পারি না? এ প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই কতক বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট বিষয়ের উত্তর দিতে হইলে যে যে বিষয় বলা আবশ্যক, তাহা বলিতে সাহস করিতে পারিলাম না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, শত শত ব্যক্তি মানস সরোবরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহা দর্শনার্থ যাত্রা করিল। কিন্তু যাহারা কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে গমন করিল তাহারা যাবজ্জীবন ঘোরতর কষ্ট পাইয়াও মানস সরোবর দেখিতে পাইল না। আর যাহারা উত্তর দিকে গমন করিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া উচ্চতম পর্ব্বত দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত হইল, অথবা অপথে গমন জন্য অল্পদিনের মধ্যেই জীবলীলা সাঙ্গ করিল। তবে কোনও সুবুদ্ধি ও সৌভাগ্যবান্ পুরুষ বহু ক্লেশের পরে মানস

সরোবর দেখিতে পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু যিনি মানস সরোবর দর্শন করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ যদি অপর শত শত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যান, তবে তাহারা কি অনায়াসে বা অল্লায়াসে মানস সরোবর দেখিতে পারে না? এজন্যই বলি যে, ব্রহ্মদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সাহাষ্য করিলে অনায়াসে বা অল্লায়াসে ব্রহ্মদর্শন হয়, নতুবা পূর্ব্ববৎ শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে। তবে এস্থলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যিনি ব্রহ্মদর্শী নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু রূপে বরণ করা অপেক্ষা না করাই বিধেয়।

প্রাচীন আর্য্যেরা এরূপ গুরু ভক্ত ছিলেন যে, তাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই (১)। খৃষ্টানগণও গুরুকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এই তিনই তুল্য। কিন্তু মুসলমানগণ এবিষয়ে অন্যরূপ। তাঁহারা মহম্মদকে কখনও পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ ভাবেন না যে, আমি গুরুভক্তির বিরোধী, প্রত্যুত গুরুভক্তিই যে ঈশ্বর ভক্তির পূর্ব্বাবস্থা, তাহাকে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করা শিষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মদর্শী গুরু সর্ব্ব-পাশ-বিমুক্ত, সুতরাং তদীয় কার্য্যে দোষলেশাশঙ্কাও অনুচিত।

এই গুরুভক্তি প্রযুক্তই ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা শিবের শিষ্য, অর্থাৎ শিবকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শৈব নামে বিখ্যাত। এইরূপে যাঁহারা বিষ্ণুর শিষ্য, তাঁহারা বৈষ্ণব, যাঁহারা গণপতির শিষ্য তাঁহারা গাণপত্য, যাঁহারা

---

(১) গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈশ্রীগুরবে নমঃ। ইতি গুরু গীতা।

সূর্য্যের (২) শিষ্য, তাঁহারা সৌর এবং যাহারা শক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা শাক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সকল মহাত্মারা গুরুরূপে বৃত হইতেন, পরে তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যাদি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তিরা ঐ সকল মহাত্মাদিগকে মনে মনে বা পরম্পরা সম্বন্ধে গুরুরূপে বরণ করিয়া ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন (৩)। এইরূপেই ভারতে ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে ঐসকল গুরু দেব-পদবীতে অধিরূঢ় এবং পরমেশ্বরের স্থানীয় বলিয়া পূজিত হইতেছেন। কিন্তু এইরূপে পরমেশ্বর জ্ঞানে উঁহাদিগের অর্চনা যে একান্ত অসঙ্গত, তাহা কতিপয় কূপমণ্ডূক ব্যতিরেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। তবে উহা অবশ্যই সত্য যে, গুরুপূজা করা কখনও অকর্ত্তব্য নহে; বরং উহাতে আত্মোন্নতি সহজেই হইতে পারে।

ঐ পূজা যে কিরূপে করিতে হইতে, তাদ্বিষয়ে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত। কিন্তু আমি মনে করি যে, যে জাতি অতিথিকে পূজা করা সঙ্গত মনে করেন, সেই জাতিকে এই বিষয় শিক্ষা না দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু এস্থানে আবার বলিতেছি যে, সুধা ভ্রমে গরল পান করিওনা। উজ্জ্বলরত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার অঙ্গে ধারণ করিও না, পবিত্র পবিত্র (ক) জ্ঞানে কালসর্প বক্ষোলগ্ন করিও না। অর্থাৎ পাপাচারী অজ্ঞান, মূর্খ

---

(২) মনস্বী পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সূর্য্য আকাশস্থ সূর্য্য নহেন। ইনি সূর্য্য নামে খ্যাত কোনও উন্নত ব্যক্তি।

(৩) যেমন কেশব বাবু নববিধান দলের গুরু। আজ কাল যাহারা নববিধান দলভুক্ত হইতেছে, তাহারা কেশব বাবুকে না দেখিয়া থাকিলেও তিনি তাহাদের গুরু হইতেছেন।

(ক) পবিত্র = বিশুদ্ধ ও উপবীত (পৈতা)

ব্যক্তিকে কখনও গুরুরূপে বরণ করিয়া ইহকালে ও পরকালে অধঃপাতে যাইও না। যদি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, (৫) প্রেমময়াদি অবস্থা বিশিষ্ট, কঠোরতর ধর্ম্ম্যকর্ম্মে সুদক্ষ, অভেদজ্ঞান করিতে পারগ, বাক্‌সিদ্ধ, অর্থ বিষয়ে নিস্পৃহ, জাত গুণ সমূহের (৬) লয় সম্পাদনে কৃতকার্য্য বা সমর্থ, এবং পাপগ্রহণ, গৃহীত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ, আয়ুঃ প্রদানশক্তি ও আত্মার অসীমত্বসাধনা প্রভৃতিবিষয়ে সিদ্ধ, বিশেষতঃ ভক্তি, প্রেম ও শ্রদ্ধা এই গুণত্রয় সম্পন্ন ও ব্রহ্মদর্শী বা তদীয় অনুজ্ঞাত মহাপুরুষের দর্শন লাভ কর, তবে তাঁহার নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পার, এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে গুরু হইবার উপযুক্ত।

এবিষয়ে মহাত্মা ভোলানাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত অর্থের সহিত লিখিত হইতেছে।

সর্ব্বশাস্ত্র পরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বচ্ছঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
মাতাপিতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্ম পরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥

অর্থাৎ যিনি নিম্নলিখিত গুণসম্পন্ন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

(১) সর্ব্বশাস্ত্রপর অর্থাৎ সাধারণতঃ কেহ সাহিত্য, কেহবা গণিত শাস্ত্রে অনুরাগী হয়, কিন্তু যিনি পরস্পর বিপরীত শাস্ত্র সমূহে অনুরাগী।

(২) দক্ষ —ঐসকল শাস্ত্রে ও নানাবিধ ধর্ম্ম্যকর্ম্মে সুনিপুণ।

---

(৫) প্রেমময় অবস্থা, গানময় অবস্থা, দূরদর্শনময় অবস্থা এবং ভাবিজ্ঞানময় অবস্থা। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ অন্যগ্রন্থে লিখিত হইবে।

(৬) কাম, ক্রোধাদি জাতগুণ।

(৩) সদা সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ—সকল সময়েই উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহের প্রকৃতার্থ পরিজ্ঞাতা।

(৪) সুবচাঃ—উৎকৃষ্ট বাক্য বিন্যাসে সমর্থ অর্থাৎ সত্য ও প্রিয় এরূপ বাক্য বলিতে পারেন যে, তাহাতে শ্রোতার হৃদয় বিগলিত হয়।

(৫) সুন্দর অর্থাৎ প্রেমময় অবস্থার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

(৬) স্বচ্ছ—বিকার শূন্য ও সরল অন্তঃকরণ।

(৭) কুলীন—জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল ও পঞ্চভূত—এই সকল বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন।

(৮) শুভদর্শন—জগতের মঙ্গল সাধন জ্ঞান বিশিষ্ট।

(৯) জিতেন্দ্রিয়—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই এই ছয়টী যাহার বশীভূত।

(১০) সত্যবাদী—নিরন্তর সত্যভাষী।

(১১) ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মদর্শী।

(১২) শান্ত মানস—স্থির-চিত্ত।

(১৩) মাতা পিতৃহিতে যুক্ত—নিরন্তর মাতার ও পিতার হিত সাধনে রত।

(১৪) সর্ব্ব কর্ম্ম পরায়ণ—প্রয়োজনীয় কার্য্য মাত্রেই রত।

(১৫) আশ্রমী—প্রধান আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে স্থিত অথবা তাঁহার হৃদয়ে সতত ঈশ্বর বিরাজমান।

(১৬) দেশবাসী—দেশ অর্থাৎ ভূমির অংশ বিশেষে অবস্থানকারী অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারী।

---

(৭) জীবঃ প্রকৃতি তত্ত্বঞ্চ দিক্ কালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপ্ তেজো বায়বশ্চ কুল মিত্যভিধীয়তে॥ (কুলার্ণবতন্ত্রম্)

(৮) শুভং মঙ্গলকরং দর্শনং জ্ঞানং যস্য সঃ।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, মহাত্মা ভোলানাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমার উক্তির বিশেষ প্রভেদ নাই। এক্ষণে গুরু কয় প্রকার এবং কোন প্রকারের কি নাম, তাহাই লিখিত হইতেছে।

পরমেশো গুরু শ্রেষ্ঠঃ স পরাৎপর উচ্যতে।
মন্ত্র স্তদ্বাচকত্বাৎস্যা দাক্ষরগুরু সংজ্ঞিতঃ।
মন্ত্রস্য তস্য দানাচ্চ পরেশস্য প্রদর্শনাৎ
উচ্যতে সর্ব্বদা সদ্ভির্মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
জন্মদত্বাৎ প্রকীর্ত্তেতে পিতরৌ তু মহাগুরূ।
নৃপতিশ্চ তথাচার্য্যো গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সর্ব্বেষাং ভক্তি পাত্রাণাং গুরুত্বং সাধু কীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ পরমেশ্বর গুরু শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে পরাৎপর গুরু বলা যায়। মন্ত্র তাঁহার বাচক বলিয়া মন্ত্রকে আক্ষর গুরু কহে। ব্রহ্মবাচক মন্ত্র দান করেন এবং ব্রহ্ম প্রদর্শন করেন বলিয়া মন্ত্র দাতা পরম গুরু ইহা সর্ব্বদা সতেরা বলিয়া থাকেন। জন্ম দান করেন বলিয়া মাতা পিতা মহা-গুরু। রাজা ও আচার্য্য ইহাঁদিগকে পণ্ডিতেরা গুরু বলেন এবং সমস্ত ভক্তিপাত্রই গুরুজন, ইহা সাধু ব্যক্তিরা বলিয়াছেন।

অতএব সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে,

(১) গুরুশ্রেষ্ঠ পরাৎপর গুরু পরমেশ্বর
(২) আক্ষর গুরু মন্ত্র
(৩) মন্ত্রদাতা পরমগুরু
(৪) জন্মদাতা মাতাপিতা মহাগুরু
(৫)(৬) রাজা ও আচার্য্য গুরু
(৭) যাবতীয় ভক্তিভাজন জনই গুরু

(১) যিনি অনাদি অনন্ত অসীম অচিন্ত্য অবাঙ্মনসগোচর, যিনি সত্যস্বরূপ এবং যাঁহার সত্তায় অসৎ জগৎও সত্যরূপে প্রতিভাত, যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ এবং যিনি মঙ্গলময় ও দয়াময়, যিনি অজ্ঞান-দিগকে নিরন্তর জ্ঞানদান করিতেছেন ও বিষয়-বিষে জর্জরিত মানবগণকে অমৃতবিন্দু প্রদান পূর্ব্বক শান্তিযুক্ত করিতেছেন, যিনি অমঙ্গলের জন্য চেষ্টাশীল মানবদ্বারাও মঙ্গলভাব উৎপাদন করিয়া জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করিতেছেন, যিনি অনন্ত দয়ানিধি, সতত দয়াদানে বিপন্ন-দিগের বিপদুদ্ধার করিয়া দিতেছেন এবং যিনি জগতে প্রকাশ, কর্ম্ম বা চাঞ্চল্য ও আবরণ এই গুণত্রয়ের সমাবেশ দ্বারা স্বকীয় স্বপ্রকাশ নাম জগতে প্রকাশিত করিয়া, পালন, সৃষ্টি ও লয়ের মূল স্ব-হস্তেই রক্ষিত করিয়াছেন ! সেই সর্ব্বগুণনিধি, অনন্তাতীত আনন্দনিধি, সর্ব্বশক্তিমান পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে সর্ব্বগুরু শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরাৎপর গুরু, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

(২) যে বর্ণময় বীজ পরমেশ্বর বাচক, তাহা অক্ষরাত্মক বলিয়া আক্ষর গুরু শব্দে কথিত হয়। এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা ক্রমশঃ পরমেশ্বর-সান্নিধ্য লব্ধ হয়, বলিয়া ইহাকেও মহাত্মারা গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। এমন কি, তান্ত্রিকেরা ইহাকেই পরম গুরু বলেন। যথা—

মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রশ্চ পরমো গুরুঃ।
পরাপর গুরু স্ত্বংহি পরমেষ্ঠী হ্যহং প্রিয়ে ॥

অর্থাৎ অয়িপ্রিয়ে ! মন্ত্রদাতা গুরু বলিয়া কথিত, মন্ত্র পরমগুরু, তুমি পরাপর গুরু এবং আমি পরমেষ্ঠী গুরু। ইহা শিব ভগবতীর নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্তশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। (১)

---

(১) এই বীজের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপাসনা গ্রন্থের ২য় ভাগে দেখ।

(৩) মন্ত্রদাতা যে পরমগুরু, তাঁহার সাহায্য গ্রহণ যে একান্ত আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। দেখ, নীতিশাস্ত্রকারগণ বলেন যে,

তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে,
সামান্যাস্তু পরার্থ মুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে,
তে তু মানুষ রাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে,
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥

অর্থাৎ যাঁহারা স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপ্রয়োজন সাধন করেন, তাঁহারা সৎপুরুষ। যাহারা স্বার্থের অবিরোধে পরার্থের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। যাহারা স্বার্থের নিমিত্ত পরহিত নষ্ট করে, তাহারা মানুষ রাক্ষস। আর যাহারা নিরর্থক পরহিত নষ্ট করে, তাহারা যে কীদৃশ জীব, তাহা আমরা জানি না। অতএব জগতের সৎপুরুষেরা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরার্থ ঘটনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাদিগের হিতব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, যিনি স্বীয় অমূল্য সময় তোমাদিগের জন্য ব্যয়িত করিতেছেন, যিনি তোমাদিগের দুঃখ দারিদ্র্য নিবারণার্থে স্বয়ং দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করিতেছেন, যিনি তোমাদিগের পাপতাপ হরণার্থে বহু সময়ে সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন, এবং যিনি তোমাদিগের নিকট কিছুই চাহেন না, কেবল তোমাদিগের উন্নতি, আরোগ্য, সৌভাগ্য দর্শন করিয়াই পরম সন্তোষলাভ করেন, সেই স্বার্থলেশবিবর্জিত নিস্পৃহ, শান্তচিত্ত ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ যে মানব মাত্রেরই ভক্তিভাজন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এজন্যই বলিতেছি যে দীক্ষাদাতা পরমগুরু।

(৪) জন্মদাতা মাতাপিতা যে মহাগুরু, ইহা ভক্তি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখ।

(৫) রাজা যে আমাদিগের গুরু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্র-কারেরা বলেন যে, "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি নির্ম্মিতো নৃপঃ।" অর্থাৎ রাজা অষ্টদিক্‌পালের অষ্টমাত্রায় নির্ম্মিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ও যাঁহার প্রতি ভগবান্ কোটি কোটি মানবের উল্লিখিত ভার প্রদান করেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। সেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষ যে ভক্তিভাজন ও গুরুপদ বাচ্য, তদ্বিষয়ে সংশয় করার কোনও কারণ নাই। অভি-নিবেশ সহকারে বিচার করিলে প্রতীতি হইবে যে, যাঁহারা আমাদিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে পরিচালিত করেন, যাঁহারা আমা-দিগের উন্নতি সাধনে নিরন্তর ব্যাপৃত, সুতরাং যাঁহারা আমাদিগের ভক্তি ভাজন, তাঁহারাই গুরু বলিয়া অভিহিত। রাজাও আমাদিগকে অসৎ-পথ হইতে নিবৃত্ত ও সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন এবং আমাদিগের উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছেন, সুতরাং রাজা আমাদিগের ভক্তির পাত্র ও গুরুজন। এ কারণ রাজার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজভক্তি না থাকিলে অনন্ত জগতের রাজা জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস করা অসাধ্য। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান রাজার অর্থাৎ ইংরাজ রাজের অধিকারে আমরা পরম সুখে আছি। দুর্ভিক্ষাদি সময়ে রাজা দূরদেশ হইতে তণ্ডুলাদি আনয়নের এবং নিঃস্ব-দিগকে তাহা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করিতেছেন। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে ইংরেজ রাজ্যে আমরা যেরূপ সুখে ও নিরাপদে আছি, এরূপ অবস্থা হিন্দুরাজত্বেও ছিল না। তখন রাজা যে ধর্ম্মাবলম্বী হইতেন, প্রজাকেও ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সেইধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইত, রাজা শাক্ত হইলে, শৈব বৈষ্ণবাদির ঘোর বিপদ, এবং বৈষ্ণব হইলে শাক্ত শৈবাদির বিপদের শেষ থাকিত না। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা ছিলনা। আর ধন মানাদি

সমুদায় হইতে ধর্ম্ম যেমন প্রধান, অন্যান্য বিষয়ের স্বাধীনতা অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতাও তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা আমরা ইংরেজ রাজত্বে ভোগ করিতে পারিতেছি। একারণ ইংরাজ রাজের প্রতি ভক্তি করা এবং কায়মনো বাক্যে ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

(৬।৭) আচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তিভাজন জনগণও আমাদিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে পরিচালিত করেন। ইহাঁদিগের যত্নে আমরা মৃৎপিণ্ড প্রায় অবস্থাপন্ন থাকিয়াও জ্ঞানধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি লাভ করিতে সমর্থ হই এবং ইহাঁদিগের চেষ্টায় আমরা পরাবিদ্যার অঙ্গ স্বরূপ অপরাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারি, সুতরাং ইহাঁরাও যে আমাদিগের গুরুপদবাচ্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে সকল গুরুর বিষয় লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দীক্ষাদাতার কার্য্য নির্দ্দেশ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দীক্ষাদাতা গুরুর কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে প্রথম কর্ম্ম পাপ গ্রহণ ও অভেদ জ্ঞান পূর্ব্বক দীক্ষাদান, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য বিপদ হইতে শিষ্যকে রক্ষাকরা এবং তৃতীয় কর্ত্তব্য তাহার উপযুক্ত অভিলাষ পূর্ণকরা। এক্ষণে দীক্ষাদানের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে গুরুবিষয়ক আরও কতিপয় কথা লিখিত হইতেছে। কিরূপ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং কিরূপ গুরুর নিকটে কদাচ দীক্ষা গ্রহণ করিবে না, তৎসমুদায় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি কোনও ব্যক্তি পাপাচারী ও অনুপযুক্ত গুরুর নিকটে অথবা স্ত্রীলোকের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করে, তবে উক্ত দীক্ষা প্রকৃত না হওয়াতে অন্য উপযুক্ত গুরুর নিকটে যাইয়া উক্ত দীক্ষা বীজের সংস্কার করাইবে (৯)। ইহাতে গুরুত্যাগ

(৯) অঙ্গহীনৈ র্জ্ঞানহীনৈঃ পাপিভি র্ব্যভিচারিভিঃ
প্রদত্তো গুরুভি র্ম্মন্ত্রঃ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।
তথাচ---স্বপ্নলব্ধঃ স্ত্রিয়া দত্তঃ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।

দোষ হয় না। মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধ স্তথাশিষ্যোগুরো গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ। অর্থাৎ মধুলোলুপ ভৃঙ্গ যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞান লাভেচ্ছু শিষ্যও তদ্রূপ এক গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকট গমন করিতে পারে।

এ পর্য্যন্ত গুরুসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে শিষ্য সম্বন্ধে কিছু লেখা যাইতেছে।

আস্তিকো দৃঢ় ভক্তিশ্চ, গুরৌ মন্ত্রে তথেশ্বরে।
এবং বিধো ভবেচ্ছিষ্য ইতরো দুঃখকৃদ্ গুরোঃ॥

অর্থাৎ যিনি গুরুর প্রতি, মন্ত্রের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়ভক্তি সম্পন্ন এবং যিনি আস্তিক অর্থাৎ পরলোকের অস্তিত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, তিনিই শিষ্য হইতে পারেন। অন্যবিধ শিষ্য কেবল গুরুর দুঃখদায়ক।

দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি নিম্নে লিখিত হইল।

দীয়তে জ্ঞান মত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ!
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভি স্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতোদদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
মহাপাতক লক্ষাণি উপপাতক কোটিকাঃ।
ক্ষণাদ্ দহতি দেবেশি দীক্ষাহি বিধিনা কৃতা॥

অর্থাৎ অত্যন্ত জ্ঞান দীয়মান হয় এবং সঞ্চিত পাপ ক্ষীণ হয় বলিয়া তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা বলেন। যেহেতু দিব্যজ্ঞান দান করে ও পাপের ক্ষয় করে, সেইজন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা কহেন। হে দেবেশি! দীক্ষা নিয়ম পূর্ব্বক কৃত হইলে লক্ষ লক্ষ মহাপাতক ও কোটি কোটি উপপাতক ক্ষণকাল মধ্যে দগ্ধ করিয়া থাকে।

দীক্ষা কি? দীক্ষা একটী পরম জন্ম, এই জন্মের পিতা গুরু, মাতা বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা (বিশিষ্ট জ্ঞান), শ্রদ্ধা তাহাদিগের প্রকৃত প্রেম, শুক্র প্রণব যুক্ত বীজ, শোণিত বিশ্বের মনোহর ভাব এবং জন্মভূমি পরমেশ্বরের পরম প্রেমময় অঙ্ক দেশ। দীক্ষারূপ জন্ম যাহার হয় নাই, তাহার পক্ষে নরজন্ম বিফল।

দীক্ষা স্যাৎ পরমং জন্ম সর্ব্বেষাং দেহধারিণাম্।
বাহ্য জগজ্জ্ঞতা মাতা জন্মন্যস্মিন্ পিতা গুরুঃ।
তয়োশ্চ প্রকৃতং প্রেম শ্রদ্ধা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
শুক্রং সপ্রণবং বীজং শোণিতং বিশ্বচারুতা।
পরেশস্যাঙ্কদেশশ্চ জন্মভূমি র্গরীয়সী।
দীক্ষা-জন্ম-বিহীনস্য নর-জন্ম বৃথা ভবেৎ॥

ইহার বঙ্গানুবাদ প্রথমেই লিখিত হইয়াছে। অতএব দীক্ষার্থি মাত্রের বাহ্য জগতের জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং বিশ্বের মনোহর ভাবে বিমোহিত হওয়াও বিধেয়। পক্ষান্তরে গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও আস্তিকতা না থাকিলে দীক্ষা লাভ করা বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব উক্ত গুণদ্বয় যাহার আছে তাহাকেই দীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিরূপে দীক্ষা দিতে হয়, তাহা গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে। এক্ষণে দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

(১) দীক্ষিত ব্যক্তি প্রতিদিন অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় জগদীশ্বরের উপাসনা করিবেন। ইহাতে অসমর্থ হইলে ১০৮ বার স্বীয় বীজ উচ্চারণ এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে অন্ততঃ ২০ বার স্বীয় বীজ উচ্চারণ করিবেন। যে দীক্ষিত আত্মোন্নতির জন্য সবিশেষ লালায়িত, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিবেন।

উপাসনার পক্ষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও নিশীথ (অর্দ্ধরাত্র) অতি প্রশস্ত সময়। তদ্ভিন্ন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নও উৎকৃষ্ট কাল। অতএব ঐ পঞ্চ সময়ে উপাসনা করিবে এবং আহারাদি কালে, গমন কালের প্রথমে, আহারান্তে, আগমন কালের প্রথমে ইত্যাদি সময়ে স্বীয় বীজ অন্ততঃ দ্বাদশ বার উচ্চারণ করিবে। বীজার্থ বোধ হইলেই জানিতে পারিবে যে উহা পরমেশ্বরের গুণবাচক শব্দ মাত্র। অতএব সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, কার্য্য মাত্রের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল নাম স্মরণ করিবে। পরমেশ্বরের দর্শন লাভের পূর্ব্বে ব্রহ্ম ধ্যান সম্পূর্ণ হইতে পারে না, কারণ ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। তৎকালে কেবল পরমেশ্বরের গুণরাশিই চিন্তা করিবে। তখন তদীয় অরূপ রূপ চিন্তা করার শক্তি কিরূপে হইবে? কিন্তু তাহা বলিয়া ধ্যান ত্যাগ করিবে না। ইহার সবিশেষ বিবরণ পরে দেখ।

এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, এদেশে সাধারণতঃ যে দীক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা প্রকৃত দীক্ষাই নহে। কারণ শুক্রের অভাবে যেমন জন্ম হইতে পারে না, তদ্রূপ দীক্ষারূপ জন্মও সপ্রণব বীজরূপ শুক্রের অভাবে হইতে পারে না। এদেশের গুরুগণ যে বীজ দেন, উহার সঙ্গে প্রণব মিশ্রিত থাকে না। কিন্তু মূলমন্ত্র প্রণব যুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, গায়ত্রীরও আদি ও অন্তে প্রণব থাকা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যা দাদা বন্তেচ সর্ব্বদা।
ক্ষরত্যনোং কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥
ইতি গুণ-বিষ্ণু-ধৃত-স্মৃতিবচনম্।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আদি ও অন্তে সর্ব্বদা প্রণব উচ্চারণ করিবেন। যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি ও শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি হয়। মন্ত্র অর্থাৎ দীক্ষা বীজ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধ্যৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥
মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

যেহেতু সংসিদ্ধি নিমিত্ত বিশ্ব বিজ্ঞান সাধক মনন ও সংসার বন্ধন হইতে ত্রাণ, করে বলিয়া ইহা মন্ত্র বলিয়া উক্ত হয়। অথবা ইহার মনন হেতু পরিত্রাণ পাওয়া যায় বলিয়া ইহা মন্ত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

২। গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিবে।

(ক) মাতা ও পিতা জন্মদানের কারণ এবং প্রতিপালনের হেতু, এ হেতু তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিবে। মাতা পিতার প্রতি ভক্তি না করিলে জগৎ পিতার প্রতি ভক্তি করা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ মৎ প্রণীত ভক্তি প্রবন্ধে দেখ।

(খ) গুরুর প্রতি পরমা ভক্তি করিবে। নতুবা জগদ্‌গুরু জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি করা সুকঠিন হইবে।

(গ) রাজার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস করিবে। রাজ ভক্তি না থাকিলে অনন্ত জগতের রাজা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

৩। সর্ব্বদা সত্য বাক্য বলিবে এবং সর্ব্ব বিষয়ে সত্য ব্যবহার করিবে। প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিবে না। ফলতঃ অসত্যকে একেবারে দূরে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।

৪। পরের দ্রব্য হরণ করিবে না এবং হরণ করিতে চিন্তাও করিবে না।

৫। জিতেন্দ্রিয় হইবে। কাম ক্রোধাদি দোষ নিবারণার্থে সর্ব্বদা সযত্ন থাকিবে। কখনও অগম্যায় গমন করিবে না। স্বীয় পত্নীতেও

যথা নিয়মে ও যথা সময়ে গমন করিবে। কদাচ ক্রুদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবেনা। ক্রোধের উদ্রেক হইলে শতবার স্বীয় বীজ উচ্চারণ করিবে।

৬। কখনও আত্ম হত্যা বা নরহত্যা করিবে না এবং তজ্জন্য চিন্তাও করিবে না। অকারণ ইতর জীবহত্যাও করিও না।

৭। যাহাতে বুদ্ধি শক্তির উৎকর্ষ জন্মে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে।

৮। ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের জন্য যথোচিত সাধনা করিবে। সাধনা প্রথমে স্বীয় চেষ্টায় আরম্ভ করিবে, পরে আবশ্যক হইলে গুরু মুখে জ্ঞাত হইবে।

৯। মৃত্তিকা বা সাবান ও জল প্রভৃতি দ্বারা গাত্র এবং বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা মনঃ পবিত্র রাখিবে। সবিশেষ যত্নে বিদ্যাশিক্ষা করিবে। বিদ্যা শিক্ষাব্যতিরেকে ধর্ম্ম বিষয়ক সুকঠিন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। স্বয়ং সমর্থ হইলেও অপরকে বুঝাইবার শক্তি লাভ হইবে না।

১০। প্রতিদিন গুরু মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। এই ধ্যান প্রভাবে ও পরম পিতার উপাসনা বলে ধ্যান কালে ক্রমশঃ নিম্নলিখিত বিষয়েও জ্ঞান হইবে। তথাচ

দৃশ্যতে জ্ঞায়তে চৈব ধ্যানস্থেন মনস্বিনা।
প্রথম মন্ধতমসং দ্বিতীয়ং বিরলং তমঃ।
তৃতীয়ং স্বল্পকালস্থা মূর্ত্তি র্বা দীর্ঘকালগা।
ততো হ্যমরাণাং জ্যোতীংষি পঞ্চমং কথনং সুরৈঃ।
ষষ্ঠে তেজো ব্রহ্মণশ্চ সপ্তমে ব্রহ্ম দর্শনম্।
এতেষাং বিবৃতিঃ প্রাপ্যা শ্রীগুরোর্ব্বদনাম্বুজাৎ॥

অর্থাৎ ধ্যানস্থ মনস্বী মানব ক্রমশঃ এই সকল দেখিতে ও জানিতে পারেন। প্রথমে তিনি গাঢ়তর অন্ধকার দেখেন; দ্বিতীয় সময়ে বিরল

অন্ধকার ; তৃতীয় সময়ে মূর্ত্তি দর্শন, এই মূর্ত্তি কখনও অল্পকাল এবং কখনও বা দীর্ঘকাল থাকে। চতুর্থতঃ দেবগণের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগণ শব্দে পরলোক গত মহাত্মা বা ইহ লোকস্থিত মহাত্মা বুঝাইতেছে। অনন্তর ঐ সকল মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন হয়। ইহাই পঞ্চম অবস্থা। ষষ্ঠাবস্থায় ব্রহ্মের তেজোদর্শন হয়। এই তেজে ও দেবতেজে অনেক প্রভেদ, প্রত্যক্ষ না হইলে বুঝাইবার সাধ্য নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে দেব তেজ দর্শনে মনে কেবল আনন্দ সঞ্চার হয়, ব্রহ্ম তেজোদর্শনে জ্ঞান লাভ, প্রেম লাভ ও আনন্দ লাভ হওয়াতে অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়া থাকে। সপ্তমে ব্রহ্ম দর্শন। ব্রহ্মও অনির্ব্বচনীয় এবং তদীয় দর্শনও অনির্ব্বচনীয়, ইহা প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ ভাষা জগতে নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর, যদি ভগবন্নামামৃত পানে সংসার-বিষজ্বালা হইতে বিমুক্ত হইতে অভিলাষ কর, যদি পরমেশ্বরের প্রেম সুধা পানে অভিলাষী হও এবং যদি মানব জীবনের সফলতা লাভ করিবার ও ব্রহ্ম দর্শনজনিত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম কর এবং ঐগুণ-ত্রয় ও অন্যান্য মহান্‌গুণ লাভ করিবার জন্য এবং সাধনা মার্গে সুচারু রূপে পরিচালিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মদর্শী মহাত্মাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া জীবন সফল কর এবং অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হও।

ওঁ

ধর্ম্মার্থীর কর্ত্তব্য।

১। সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় জগদীশ্বরের উপাসনা করিবে। সেই সৎ স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের অন্তর্বহির্ব্যাপিনী সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে; সেই জ্ঞান স্বরূপের অতি সমুজ্জ্বল জ্ঞানাগ্নি-প্রভায় প্রথমে আত্মাকে ও তৎপরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রদীপিত দর্শন করিবে এবং সেই আনন্দ স্বরূপের আনন্দ স্রোতে প্রথমে আপনাকে ও তৎপরে নিখিল জগতকে প্লাবিত বিলোকন করিবে।

২। জগদীশ্বরের উপাসনার্থে ভক্তি, প্রেম, একাগ্রতা প্রভৃতি যে সকল গুণের প্রয়োজন, তৎসমুদায়ের সাধনা করিবে।

৩। উপাসনা করিতে করিতে কতকগুলি বিভূতি উপস্থিত হইবে। কিন্তু তৎসমুদায়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যাহাতে প্রেমানন্দময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পার, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে। যাহারা বিভূতি অর্থাৎ সিদ্ধি লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন অতি সুদুর্লভ।

৪। পরমেশ্বরের দর্শন লাভের পূর্ব্বে ধ্যানাবস্থায় ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত রূপে জ্ঞান লাভ ঘটিয়া থাকে। যথা প্রথম গাঢ় অন্ধকার, দ্বিতীয় বিরল অন্ধকার, তৃতীয় স্বল্পকালস্থা বা দীর্ঘকাল স্থায়িনী মূর্ত্তির দর্শন; চতুর্থ দেবগণের জ্যোতির্দর্শন, পঞ্চম দেবগণের সহিত কথোপকথন, ষষ্ঠ ব্রহ্ম-জ্যোতির্দর্শন এবং তৎপরে ব্রহ্মদর্শন।

৫। মাতা, পিতা, শিক্ষক, রাজা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের প্রতি যথোচিত ভক্তি করিবে।

৬। দেব দেবীগণের প্রতি ভক্তি করিবে। দেব দেবীগণ অর্থাৎ হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, দুর্গা, কালী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি এবং খৃষ্টানাদি শাস্ত্রানুসারে পবিত্র আত্মার প্রতি ভক্তি করিবে। ইহাঁরা সকলেই

এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছেন এবং পরমানন্দময় ধামে অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছেন।

৭। প্রয়োজনানুসারে দেব দেবী গণের পূজা করাও অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই জগদীশ্বরের তুল্য জ্ঞান করিবে না। এই পূজা সূক্ষ্মভাবে কেবল মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সম্পন্ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যাহারা তৎপক্ষে অসমর্থ, তাহারা "প্রতিমায়াং ঘটে পটে" অর্থাৎ প্রতিমায়, ঘটে বা পটে ঐ পূজা করিতে পারে। কিন্তু ইহা অধম কল্প। আর এই শেষোক্ত প্রকার পূজার সময়ে যাহাতে দেব দেবীর আবির্ভাব হয়, এরূপ করিতে না পারিলে এ পূজায় বিশেষ কোনও ফল হয় না।

৮। যে সকল মহাত্মারা জগতে সিদ্ধ বা পরমোন্নত হইয়াছিলেন, যথা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি, তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত ভক্তি করিবে।

৯। যাঁহার কৃপায় তুমি সৎপথ—জগদীশ্বর লাভের পথ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই গুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিবে।

১০। যাঁহারা অনন্ত গুণের মধ্যে কোনও গুণে অনন্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা "একত্ব প্রাপ্ত" বলিয়া অভিহিত হন। একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণ "ঈশ্বর" শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। এই কথন বশতঃই ভারতে দেব দেবীগণ ও বুদ্ধাদিকে তত্তৎ পূজকগণ পরমেশ্বরের আসনে উপবিষ্ট বোধ করিয়াছেন। এবং তাহার নকল করিতে গিয়াই খৃষ্ট শিষ্যগণ খৃষ্টকে পরমেশ্বরের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যিনি যত একত্বই লাভ করুন না কেন, অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ পরমেশ্বরের তুল্য হইতে পারেন না। (১)

---

(১) ঈশ্বর ও পরমেশ্বর যে এক নহেন, ইহা মহাদেব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ ইত্যাদি।

১১। একত্ব প্রাপ্ত বা তত্তুল্য গুণ সম্পন্ন মানবগণই "অবতার" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অবতার বলিতে যে পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরূপ বুঝিতে হইবে না। পরন্তু পরমেশ্বরের কোনও গুণের অনন্তাভিমুখী অবতীর্ণতা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সাধক কোনও কোনও গুণে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বা একত্ব প্রাপ্তের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন, ইহাই জানিতে হইবে।

১২। দেহ মধ্যে যে সাতটী প্রধান চক্র এবং প্রধান ও অপ্রধান সমুদায়ে দশটী বা চৌদ্দটী চক্র আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সংসতীগণ উহার সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। যে সকল শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় ঐ সকল চক্রের বিকার জন্যই হইয়া থাকে।

১৩। সত্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তৎপরে গুরুদেবের আদেশ লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। কেহই আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন না। তবে ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিবিধ শাস্ত্র পাঠ ও বহুবিধ সাধনা করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তখনও শাস্ত্র পাঠে ও সাধনায় ক্ষান্ত হইবেন না। অনন্তর পুত্র উৎপন্ন ও সৎ পথাবলম্বী হইলে এবং সে স্বয়ং সংসার নির্ব্বাহে সমর্থ হইলে, আবশ্যক মত সংসার ত্যাগ করিতেও পারেন। (২)

১৪। ইহাঁরা ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থ এবং ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে বাসনা পূরণ করিবেন। অনন্তর পূর্ব্ব লব্ধ দীক্ষাবীজ অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধনাদ্বারা মোক্ষ মার্গ প্রাপ্ত হইবেন।

১৫। ইহাঁরা প্রয়োজন অনুসারে উপবাস করিবেন। কিন্তু উপবাস

(২) যিনি যে আশ্রমেই বসত থাকুক না কেন, সংসারাশ্রমীর অনুকূল ভাবে কার্য্য করিবেন।

করিলেই যে ধর্ম্ম হয়, কখনও এরূপ চিন্তা করিবেন না। এবিষয়ে শাস্ত্র-কার দিগের মত এই—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীর-বিশোষণম্॥

অর্থাৎ পাপ সমূহ হইতে উপাবৃত্ত (প্রতিনিবৃত্ত) হইয়া গুণসমূহের সহিত যে বাস, তাহাকে উপবাস বলিয়া জানিবে কিন্তু শরীর শোষণকে উপবাস বলিয়া জানিবে না।

১৬। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে। কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিবে যে তোমরা সত্য স্বরূপের সন্তান। শাস্ত্র বিশেষে লিখিত আছে যে,

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি, ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহ কালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহু রপাতকানি॥

অর্থাৎ হে রাজন্! (১) ক্রীড়া করিতে করিতে বা পরিহাসচ্ছলে, (২) স্ত্রীলোকের নিকটে, (৩) বিবাহ সময়ে, (৪) প্রাণ বিনাশ কালে এবং (৫) সর্ব্ব ধনাপহরণ সময়ে যে মিথ্যা বলা যায়, তাহাতে পাপ হয় না। তোমরা এ মতের সমাদর করিও না। মিথ্যা মাত্রেই পাপ স্পর্শ হয় জানিবে। নাস্তি সত্য সমং কিঞ্চিৎ, ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্। নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদ্ অনৃতাদিহ বিদ্যতে॥ অর্থাৎ সত্যের তুল্য কিছুই নাই এবং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠও নাই। আর মিথ্যা হইতেও তীব্রতর কিছু নাই। তোমরা এই মতের সমাদর করিবে।

১৭। কদাচ ব্যভিচার করিবে না এবং তাহার চিন্তাও মনোমধ্যে উদিত হইতে দিবে না। স্বীয় পত্নীতেও যথা সময়ে ও যথা নিয়মে গমন করিবে। এইটী এবং আহার ও নিদ্রা পশুর সহিত মনুষ্যের সাধারণ কার্য্য।

অতএব যাহা না হইলে নয়, এইরূপ নিয়মে ঐ সকল বিষয়ে লিপ্ত থাকিবে, অথবা সমর্থ হইলে নির্লিপ্ত ভাবে ঐ গুলি সম্পন্ন করিবে। কদাচ অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিও না। উহাতে শারীরিক ও মানসিক এতাদৃশ অনিষ্ট সংঘটিত হয় যে, তাহার পূরণ এ দেহে আর হইতে পারে না। আর উহাতে যে কেবল দুষ্ক্রিয়া কারীরই শরীর ও মন অকর্ম্মণ্য হয় তাহা নহে। উহা দ্বারা কুকর্ম্ম কারীর বংশাবলীরও নানা ক্লেশ উৎপন্ন হইতে পারে।

১৮। ক্রোধ নিবারণে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। কদাচ ক্রুদ্ধ হইয়া কোনও কার্য্য করিবে না। কাম ক্রোধাদি জাত গুণের উৎপত্তি মাত্রেই স্বীয় বীজ ভক্তি ভাবে স্মরণ বা উচ্চারণ করিবে। ভগবন্নামের প্রভাবে সর্ব্ব দোষেরই প্রশমন হয়।

১৯। কদাচ পরদ্রব্য হরণ বা হরণ করিতে মনন, করিও না। স্বীয় পরিশ্রম লব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিবে। অপরের দান গ্রহণ করিও না, কিন্তু পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করিও।

২০। জাতি ভেদ সকল সমাজেই আছে, অথচ সকল ধর্ম্মেরই উন্নতাবস্থায় উহা থাকে না। অতএব সমাজের ও আত্মার অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ বিষয়ে কার্য্য করিবে।

২১। দুঃখে একান্ত বিষণ্ণ বা সুখে নিতান্ত আনন্দিত হইও না। সুখ দুঃখ চক্রাকারে ভ্রমণ করে। একটী উপস্থিত হইলেই জানিবে যে, অপরটী শীঘ্রই আসিবে। রাত্রি ও দিবার ন্যায় উভয়ই যে আবশ্যক তাহা সতত স্মরণ করিবে।

২২। ধৈর্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিবে।

২৩। সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে থাকিবে। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা গাত্র, ধর্ম্ম দ্বারা মনঃ, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শোধন করিবে।

২৪। সরল ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিবে। কপটতা মহাপাপের মূল।

২৫। যথাসাধ্য পরের উপকার করিবে। স্বার্থপরতা বিসর্জ্জনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকসমূ কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গ নলীক্ষার পোষ্ট আফিসের অধীন গোয়ালগ্রাম লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত হওয় যায়।

পুস্তকের নাম	মূল্য
সত্যধর্ম্ম	১৷৷
(প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, গুরুতত্ত্ব ও 'ধর্ম্মার্থীর কর্ত্তব্য' সহিত)।	
সুখবোধ ব্যাকরণম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্)	১৲
" (উত্তরার্দ্ধম্)	১৲
লঘু সুখবোধ ব্যাকরণ	।৵০
ব্যাকরণ সোপান	৶০
সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত	।০
সুনীতি সংগ্রহ	৵০
রচনামালা (সংক্ষেপে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়)	১৲
বীরোত্তর কাব্য (মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্যের উত্তর)	৷৷৵০
হিতদীপ	৵০